JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

The Equation of Displaced Life: Outlines of the Crisis and Transition of Refugee Women (1947-1971)

বাস্তুচ্যুত জীবনের সমীকরণ : শরণার্থী নারীদের সংকট ও উত্তরণের রূপরেখা (1947-1971)

Sunita Biswas, Assistant Teacher, Kurmitola High School
Lalbagh, Murshidabad, West Bengal

Abstract:- Partition and migration are considered a reflection of Indian culture. The country With the partition, Bengal was also divided. The tears and blood of millions of people were mixed with the partition of the country, in this case the community became bigger than the nation: communal jihad overshadowed the national struggle. India witnessed world largest migration during 1947 when India Pakistan got independence. In the partition of India, namely Bengal, religion became dominant, and humanity faded. After the partition, a large number of refugees entered India and a significant number of them were women. 'Refugee women' was a new social class, which was born out of the devastating events of the partition, which was very painful. There are numerous pictures, movies, eye witnessed, writings, news documentaries, depicting, the pain and suffering of women. Unfortunately, this particular gender bore the most lasting physical and mental scars of the partition; on the one hand as refugees and on the other as women. The women of East Bengal had to pay the price of freedom at the cost of their chastity, the lives of their husbands, themselves and their beloved children. No words are enough to describe their suffering. They became the common target of all inhuman activities. Sexual assault, bureaucratic violence, forced marriage, intimidation, religious conversion have a significant history frozen in the memories of the eyewitnesses, which turned their habitable world into hell.

The struggle of refugee women is not only an anecdote of their mental and physical suffering, which was undoubtedly a depiction of their experience of suffering for shelter, rehabilitation and employment. In this difficult journey, they emerged from the clutches of division as a distinct class of self-reliant new women and soon became social, cultural and political activists of a progressive secular trend. The main theme of the article under discussion is to shed light on the crisis and struggle for transition of refugee women.

Keywords:- Refugee women, self-reliance, migration, chastity, sexual assault, gender, communal Jihad.

ভূমিকা : - 1947 সালের ভারত বিভাজনের প্রস্তাবকে আজও সমাজের ইতিহাসে দেখা সর্ববৃহৎ অভিবাসন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।দেশ ভাগের পরের ইতিহাস শুধু ওপার থেকে এপারে চলে আসার ইতিহাস নয়, লক্ষ লক্ষ বাস্তুচ্যুত মানুষের ভালো থাকা - মন্দ থাকা, রূপ - রূপান্তর ও জীবন - যাপনের কাহিনী। এই বিভাজনের সর্বাধিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় পূর্ববঙ্গের মানুষের উপর, বিশেষ করে সেই নারীদের উপর যারা দুর্ভাগ্যবশত পূর্বে অবিভক্ত নিজেদের রাজ্যেই শরণার্থী হয়েছিলেন। মানুষের কাছে বাসস্থান হলো মনোরম ও নিশ্চিন্ত আশ্রয় , কিন্তু ইতিহাসের অনিবার্য ইঙ্গিতে তাকে বসত বাড়ি ছাড়তে হয়েছে।বাস্তুচ্যুত নারীর কাছে এ ছিল এক অপরিসীম যন্ত্রণা এবং ভবিষ্যৎ ছিল এক বিকল্পহীন পরিস্থিতি।সেদিন নিজের সতীত্ব বাঁচাতে, পেট ভরাতে, শরীরের ভেতর প্রাণের অস্তিত্বটুকু বাঁচিয়ে রাখতে নারীকে লড়তে হয়েছিল মরণজয়ী সংগ্রাম। শরণার্থী হিসেবে নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা এবং পরিচয় গ্রহণে বাধ্য হওয়ার পাশাপাশি তারা এমনসব পরিসরেরও অধিকারী হয়েছিলেন যা সুরক্ষিত সময়ে তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। পূর্ববঙ্গীয় সমাজ কাঠামোয় যে নারী ছিল অন্দরে সে সদরে বেরিয়ে এলো দেশভাগের পর। মুক্তির পথে,আত্ম বিশ্বাসের পথে মেয়ে হিসেবে আত্মপরিচয় পাওয়ার জন্য এই পদক্ষেপ। দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের সমাজ বদলের ক্ষেত্রে নারী সমাজের ভাঙ্গা গড়ার কাহিনী ; একদিকে তার শরীর মনের বিকাশ অন্যদিকে আত্মজাগরণের স্বপ্ন সমাজকে দ্রুত বদলে দিয়েছে। এই বদল যেমন তার পরিবারের অন্দরে তেমনি সমাজের বৃহত্তর অঙ্গনে।

মানচিত্রের ক্ষত, সীমান্তের কাঁটাতার ও নারীর শরীর : - নারীদের জন্য দেশ ভাগের যন্ত্রণা ছিল সীমাহীন এবং বিভাজন ছিল উদ্বাস্তু পরিবারের টিকে থাকার লড়াই ,যেখানে প্রতীয়মান হয় নারীদের আত্মত্যাগের এক বিশাল ক্যানভাস।বিভাজন

পরিস্থিতিতে নিরীহ নারীরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন। ধর্মের ভিত্তিতে সৃষ্ট একটি রাষ্ট্রে নারীরা যারা অন্যদের চেয়ে দুর্বল ছিলেন তাদের শরীর ভিন্ন ধর্মের মানুষদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিল। (1950 - 1952) এই সময়ের প্রথমদিকে পূর্ববঙ্গে বর্ধিষ্ণু শ্রেণীর হিন্দুদের দেশ ত্যাগের পর তাদের জমি জায়গা দখল করে নেয় এক শ্রেণীর মুসলিম। এর পর তাদের নজর পরে বাকি সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি ও নারীদের উপর। ধীরে ধীরে অত্যাচারের কৌশলেরও কিছুটা পরিবর্তন ঘটে।সংখ্যালঘুদের মধ্যে একটু অবস্থা সম্পন্ন ব্যাক্তি যাদের বাড়িতে যুবতী কন্যা আছে তাদের বাড়িতে ডাকাতি হতে লাগলো ঘন ঘন।(1) (1961- 1970) এই সময় কালে ব্যাপক সংখ্যক নারী লাঞ্ছিত হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় অনেকে মুসলমানদের সাথে ঘর বেঁধেছে, যা হিন্দু মানসিকতায় তীব্র আঘাত হেনেছে এবং সামাজিক সম্মান বাঁচাতে তার অভিবাবক ও আত্মীয় স্বজনদের দেশত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। যশোধরা বাগচী রচিত ' দ্য ট্রমা অ্যান্ড ট্রায়াম্প ' গ্রন্থে সুতারা নামের এক বাঙালি হিন্দু মেয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বারা লাঞ্ছিত হওয়ার পর জ্ঞান হারায়। 1946 সালের নোয়াখালী ও টিপ্পেরা দাঙ্গার পর সুতারা ও তার পরিবার পালাতে শুরু করে। তার মা নিজের সম্মান বাঁচাতে জলে ঝাঁপ দেন এবং তার বাবা ও বড় বোন নিখোঁজ হয়ে যান। সুতারা তার প্রতিবেশী মুসলমান সম্প্রদায়ের তমিজউদ্দিন এর বাড়িতে আশ্রয় নেয়।তমিজউদ্দিন নিজ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে হুমকি সত্ত্বেও সুতারার লালন - পালন করেন।

সূত্র: https://www.sentinelassam.com/more-news/editorial/a-trainload-of-dead-bodies-partition-horrors.

এই মর্মান্তিক ঘটনার কথা শুনেও সুতারার বড় ভাইয়ের প্রতিক্রিয়া ছিল নিরুত্তাপ। অবশেষে তমিজউদ্দিন ও তার ছেলের সাহায্যে সুতারাকে কলকাতায় তার ভাইয়ের

বাড়িতে পাঠানো হলে সুতারা তার ভাইয়ের শ্বশুর বাড়িতে অতিথী হিসেবে আশ্রয় পায়। সেখানে তার রান্নাঘরে প্রবেশের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। একটি মুসলমান বাড়িতে ছয়মাস থাকা এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বারা লাঞ্ছিত হওয়ার কারণে তার সাথে অস্পৃশ্যের মত আচরণ করা হতো। অবশেষে তাকে একটি খ্রিষ্টান মিশনারি হোস্টেলে পাঠানো হয়।

যেখানে তার সাথে দাঙ্গার শিকার হওয়া সমগোত্রীয় মেয়েদের দেখা হয়। এই ধরনের ভুক্তভোগী মেয়েরা দুবার লাঞ্ছিত হয়েছিল : প্রথমবার একটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দ্বারা, যারা অন্য সম্প্রদায়ের নারীদের নিপীড়ন করে নিজেদের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। দ্বিতীয়বার তার নিজের পরিবারের সদস্যদের দ্বারা, যাদের কাছে নারীর পবিত্রতা তার আত্মায় নয় দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।(2) 1950 সালের 5 ই এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তানের সাতক্ষীরা ও খুলনায় 500 জন সামরিক সদস্য কর্তৃক হিন্দু নারীদের কাছ থেকে সোনার গহনা ছিনিয়ে নেওয়ার বিষয়ে বসিরহাট থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হলে তারা নারীদের উপর নির্যাতন চালায় এবং তাদের পোশাক খুলে ফেলতে বাধ্য করে। (3) একশ জন মুসলিমের একটি দল রুদ্রপুরে বিবাহ সংক্রান্ত একটি সভার আয়োজন করে এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে, মুসলিম পুরুষ ও হিন্দু ব্রাহ্মণ মহিলাদের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হবে। গান্ধীজিও উদ্বাস্তুর বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিয়েছিলেন ও নোয়াখালীর দিকে তার যাত্রা শুরু করেছিলেন। এবং যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন হিন্দু উদ্বাস্তু নারীদের দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা করা, কারণ তাদের অধিকাংশই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন।(4) নারীদের কাছে প্রাণের চেয়ে মান বড়,আর তাই নারীদের যে কোনো পরিবারের মর্যাদার সাথে একাত্ম করে দেখা হয়। নারীরা প্রকৃতিগত ভাবে কোমল। সবকিছু ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে এত মানুষের পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে আসার পেছনে দায়ী কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হলো প্রাণের মায়া এবং নারীর সম্মান রক্ষার চেষ্টা।ভারতের স্বাধীনতা লাভকালীন সময়ে মেয়েরা বিশেষত বাঙালি পরিবারের মেয়েরা ছিল একান্নবর্তী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, অতি অল্প বয়সে তাদের বিবাহ হতো এবং পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তির নির্দেশক্রমে পর্দানসীন ভাবে তাদের জীবন অতিবাহিত হতো। অতি প্রয়োজনে কদাচিৎ তারা বহির্জগতে পা রাখতেন। নিজ পিতৃ ও শ্বশুরকুলের কুলমর্যাদা এবং নিজের সতীত্ব রক্ষা করে চলা নারীর অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল। দেশভাগের ফল স্বরূপ শুরু হওয়া নৃশংস ও বর্বরোচিত কার্যকলাপ নারীর ঠিক এই

জায়গাতেই আঘাত হানে। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানের নারীরা যে ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ' 'উদ্বাস্তু ' গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়েছে এভাবে -"এক হিন্দু মহিলা পুকুরে স্নান করতে নেমেছেন। সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু যুবক ও বৃদ্ধ মুসলমান পুকুরের দুপাশে জড়ো হয়ে আশ্লীল ছড়া কাটতে শুরু করল। এপার থেকে আওয়াজ উঠল - ' পাক পাক পাকিস্তান ', অন্যপার থেকে উত্তর এলো - 'হিন্দুর ভাতার মুসলমান ', ভীত সন্ত্রস্ত মেয়েটি জলের মধ্যে অসার হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। একজন মধ্যবয়স্ক মুসলমান সিঁড়ি বেয়ে স্নানের ঘাটে নেমে এসে বললো - " বিবিজান, দেরি হয়ে যাচ্ছে যে! দেরি করছ কেন? বাড়ি যাবে না? সে বললো - " আরে, তোদের চাচীর গাঁটগুলো শক্ত হয়ে গেছে রে, ওর নড়বার শক্তি নেই। তোরা ওকে হাত ধরে জল থেকে তুলে নিয়ে আয় "। কি ভয়ানক মানসিক নির্যাতন।(5) এ তো গেল নিছক মানসিক নির্যাতনের চিত্র কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ছিল অত্যাধিক ভয়াবহ। এক সম্প্রদায়ের নারীর উপর অপর সম্প্রদায়ের শিউরে ওঠা নৃশংসতায় ক্ষতবিক্ষত নারী শরীরগুলি যেন পৈশাচিক বিজয়ের চিহ্ন স্বরূপ প্রতিভাত হয়। একটি সূত্র থেকে জানা যায় যে, "Breast and noses are cut off their bodies branded or tattooed with signs and symbols of 'other religion', pregnant were forcibly aborted and often women were made to strip naked and paraded through the street in town and cities." (6)

সীমান্তে বিপন্ন নারীত্ব : সুরক্ষা নাকি লাঞ্ছনা : - পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী জন্ম সূত্রে পরিযায়ী। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ভাষায় ও কল্পনায় দেশ মা হিসেবে বন্দিত। যাকে তৈরি করা হয়েছে দেবী দুর্গার আদলে - ' তংহি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী '। অথচ সেই মাতৃরূপী নারীদের গরিমা, মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত ও পদদলিত হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে দেখভাগ পর্যন্ত। উদ্বাস্তু নারী হিসেবে ভারতে আসার পথটাও নেহাৎ মসৃণ ছিল না। আসার পথে বহু নারী তাদের পরিবারের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। স্টিমার,ঘাট,বিমান বন্দর, রেল স্টেশন, সীমান্ত সর্বত্র চলে একতরফা ধর্ষণ ও লুটপাট।(7) নারীর অসহায় অবস্থার সুযোগ কর্তব্যরত সরকারি কর্মচারীরাও গ্রহণ করেছিল। এ প্রসঙ্গে নিবেদিতা দেবী তাঁর 'নারীর কথা ' শীর্ষক প্রবন্ধে যথার্থই লেখেছেন -"পূর্ববঙ্গীয় নারীগণকে তাদের জীবন,সতীত্ব,স্বামী ও সন্তানের জীবনের মাধ্যমে স্বাধীনতার মূল্য চোকাতে হয়েছিল। বিপুল পরিমাণে ধর্ষণ ও বলপূর্বক বিবাহ ছিল আক্রমণকারীদের প্রধানতম অস্ত্র। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানি শুল্ক আধিকারিকগণ ও পশ্চিমবঙ্গের দিকে আসা মহিলাদের তল্লাশির নামে অসম্মানিত

করত।(8) এই সময় সীমান্ত পার হওয়া ছিল নারীর কাছে সতীত্ব রক্ষার জন্য অগ্নিপরীক্ষারই নামান্তর। যদিও তথাকথিত পবিত্রতা ও সম্মান রেখেই সীমান্ত পার হতে পারলেও এপারের মানুষেরা এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার নিজ পরিবারের লোকেরাও তাকে অসম্মানের চোখে দেখত। কারণ তারা ধরেই নিত যে, বিধর্মীরা সম্মানহানি করে তবেই তাদের ছেড়েছে।।(9) এ যেন পৌরাণিক মহাকাব্য 'রামায়ণের ' সীতার অগ্নিপরীক্ষা দেওয়ার পরেও তার সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করার সামিল। বাস্তুহারা সংকট বাঙালি নারীর জীবন মানসকে জটিল ও আশঙ্কাজনক পর্যায়ে নামিয়ে দেয়। ভারত ও পাকিস্তানের দেহ ভাগের মতোই নারীকে ভাগ করার উন্মাদনায় মেতে উঠেছিল পুরুষ রাষ্ট্রশক্তি।(10) অন্যসব উদ্বাস্তুর সাধারণ দুঃখ কষ্টের অংশীদার হওয়ার সাথে সাথে মেয়েদের অতিরিক্ত দুর্দশার ভাগ নিতে হয় - তা হল নারীত্বের অবমাননা। আর এক্ষেত্রে" Words of their immediate community is contingent upon how the politics of identity are played out, and how their resolution takes place between community and state." (11) নিজের গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সম্মান ও প্রতাপ বজায় রাখতে মেয়েদের উপর আক্রমন হয়েছে দুদিকের নবনির্মিত রাষ্ট্রযন্ত্রে, মেয়েদের প্রতিদিন, প্রতিরাতের অসহনীয় দুঃখ ও লাঞ্চনাকে উপেক্ষা করে তথাকথিত নারীত্বের মূল্যকে অমান্য করে পুরুষকেন্দ্রিক মতাদর্শের দিকে ঝুঁকেছিল। উদ্বাস্তু নারীদের অধিকাংশেরই চোখে দেশভাগ হল ধর্ষণ, অপহরণ কিংবা বলপূর্বক বিবাহের নামান্তর।(12)

পুনর্জন্মের প্রতীক্ষায় শিয়ালদহ স্টেশনে

সূত্র: https://www.anandabazar.com/events/independence-day/was-the-day-of-freedom-completely-independent-dgtl-1.456368

শিয়ালদহের উদ্বাস্তু জননী : প্ল্যাটফর্মে নারীদের যাপনচিত্র : - দেশভাগ বঙ্গীয় নারী সমাজকে এক গভীর সংকটের গহ্বরে নিক্ষেপ করেছিল। বাস্তুচ্যুত নারীরা এক

অপরিসীম যন্ত্রণার নদী অতিক্রম করে নিজেদের সতীত্ব রক্ষা করতে ভারতের মাটিতে ছুটে এল। অগণিত মানুষ দেশান্তরী হয়ে জীবনের নিরাপত্তা, সামাজিক সম্মান ও নারীর সম্ভ্রম রক্ষার জন্য শূন্যহাতে দেশ ত্যাগ করে । পূর্ব বাংলার হিন্দুরা কাতারে কাতারে হুড়মুড় করে এদেশে প্রবেশ করে। এখানে ওখানে একফালি জায়গায় গাদাগাদি করে যতজন সম্ভব মাথা গুঁজতে হয়েছে। স্টেশনে,প্ল্যাটফর্মে,রাস্তার ফুটপাতে,রেল লাইনের ধারে,গাছ তলায় ,খোলা আকাশের নীচে, পোড়ো জমিতে বসত করতে হয়েছে দিনের পর দিন। শিয়ালদহ স্টেশনে উদ্বাস্তুদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট ক্যাম্প খোলা হয়েছিল, যা শরণার্থীদের একটি মিলনস্থলও ছিল। এখানে নারী অভিবাসীদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে, কারণ তাদের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল না। নির্দিষ্ট কোনো রান্নাঘর না থাকায় তারা প্ল্যাটফর্মের কোণায় এবং রাস্তায় যেখানে যানবাহনের চলাচল সাধারণ ছিল সেখানে তিনটি ইট দিয়ে উনুন তৈরি করে আবর্জনা জ্বালিয়ে রান্না করা খাবার খেত।(13) প্ল্যাটফর্মে নারীদের জীবন সুরক্ষিত ছিল না। শিয়ালদহ স্টেশনে পদার্পণ করতে না করতেই মা, মেয়ে - বউদের অনেকেই সতীত্ব হারিয়েছেন। কখনও কখনও তারা পাচারকারীদের সহজ শিকারে পরিণত হতো।(14) শিয়ালদহ স্টেশনে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রত্যক্ষদর্শী একজন সাংবাদিক লিখেছেন - "প্ল্যাটফর্মের কিছুটা জায়গা দড়ি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল। উদ্বাস্তু শিবিরে স্থান না পাওয়া পর্যন্ত এই জায়গাটাই তাদের ঘরবাড়ি। এই স্বল্প পরিসর জায়গায় পাঁচ থেকে ছয় হাজার মানুষ স্ত্রী,পুত্র,কন্যা নিয়ে গাদাগাদি করে দিন কাটাচ্ছে। এত মানুষের পানীয় জল সরবরাহের জন্য জলের কল মাত্র তিনটি, মহিলাদের জন্য শৌচাগার মাত্র দুটি,পুরুষদের জন্য বারোটি। বহু ত্রাণকর্মী যুবতী নারীদের দেহ ব্যবসার অন্ধকার জীবনে নিয়ে যেত। যুবতী মেয়েরা হাজার হাজার মানুষের মধ্যে খোলা জায়গায় স্নান করছে। হাজার হাজার মানুষের ব্যবহার করা শৌচাগার থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে খোলা জায়গায় মানুষ ঘুমোচ্ছে"।(15) এখানেই গর্ভবতী তার সন্তানের জন্ম দিয়েছেন হাজার হাজার মানুষের সামনে। অসহায় বাবা দেখেছে স্টেশনের পাশে নির্জন অন্ধকার কোণে ধর্ষিতা হচ্ছে তারই কন্যা। যুবতী চলে যাচ্ছে অন্য যুবকের ছায়া হয়ে। এই সময় বহু নারী তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অসহায় হয়ে পড়েন। করো পরিবারের পুরুষ সদস্য দাঙ্গায় নিহত হন এবং আত্মীয়ের বাড়িতে নারীটির স্থান সংকুলান হয়নি। আবার কোনো নারী নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক হলেও ধর্ষিতা হওয়ার অপরাধে কিংবা সন্দেহের বশে পরিবার থেকে বিতাড়িত হন। দালালের খপ্পরে

পরে বহু নারী দেহব্যবসার অন্ধকার গলিতে হারিয়ে যান চিরতরে। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় স্বাধীনতার পর দিল্লি, বোম্বের গণিকালয়গুলি উদ্বাস্তু মেয়েদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।(16)

গোপা দত্তভৌমিক

শেষ আপডেট: ০৪ ডিসেম্বর ২০২১ ০৬:৩০

ক্ষুধার্ত: শিয়ালদহ স্টেশনে উদ্বাস্তু মানুষের সারি, ১৯৭১

নীরব চিৎকার : বাস্তুচ্যুত নারীদের উপর চলমান সহিংসতা,যৌন নির্যাতন ও মানসিক আঘাত : - 1947 এর স্বাধীনতা প্রাপ্তি ম্লান হয়ে যায় সাম্প্রদায়িক বিভাজনের আঘাতে। বিভাগজনিত বাতাবরণে নারীর অবস্থা ছিল অসহায়তম। দেশভাগের কাটাকুটিতে লাঞ্ছিত হয় নারীত্ব। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ নারী নির্যাতনের উৎস। জনৈক বিশ্লেষক নারী নির্যাতনের কারণ সম্পর্কে বলেন - The basic factor is prevalent patriarchal norms, values, tradition power relation between men and women and all social structure : family, community, work place and even in the state."(17) ধর্ষিতা নারীকে পরিবারের লোকজন ঠাঁই দিতে চায়নি,তার প্রতি অসম্মান ও অবজ্ঞা নতুন সামাজিক সংকট তৈরি করেছে। ধর্ষণজাত সন্তানকে সরকারি - বেসরকারি হোমে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে, যা নারীর মনের সংকটকে প্রবল করে তুলেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতীতের কলঙ্ক ঢাকতে মিথ্যে গল্প বলতে হয়েছে। মূল্যবোধের বিসর্জন দিয়ে অন্যায়ের সাথে আপোসের প্রমাণও অজস্র। সংঘবদ্ধ বা একক ভাবে ধর্ষিত নারীর মধ্যে যে সন্তান বেড়ে উঠেছে সে ছিল অবাঞ্ছিত,তাই পরিবার ও সমাজ দ্বারা সে প্রতিমুহূর্তে তীরবিদ্ধ হয়েছে। আবার উদ্ধার করা মেয়েদের যখন গর্ভপাত করা হয়েছিল পারিবারিক ও সাম্প্রদায়িক শুচিতার দায়ে ,তখন কেমন ছিল সেই সব মেয়েদের অনুভূতি, লাঞ্ছনার চিহ্ন নিয়ে কিভাবে বেঁচে ছিল উদ্বাস্তু নারী। পরিসংখ্যান

অনুযায়ী পঁচাত্তর হাজার থেকে এক লক্ষ নারী দেশভাগের পর অন্য ধর্মের দ্বারা অপহৃত হয়েছিল।" To be raped and murdered, sold into prostitaution, or forced into marriage."এই অভিজ্ঞতা র‍্যাডক্লিফ লাইনের দুপাশের মহিলাদের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই একথা বলা যেতেই পারে যে, " Women wear distributed in the some way that baskets of orange or grapes are sold or gifted."(18) বাপসি সিদ্ধা এ প্রসঙ্গে বলেন - "Living object of whose soft bodies victors and loses alike went their warth event fantastic vendaltas and celebrate victories."

সূত্র: https://www.anandabazar.com/entertainment/koushik-sen-pens-a-tribute-to-the-veteran-director-ritwik-dgtl-1.83643

নারীদের ক্ষত বিক্ষত শরীর গুলি যেন এক সপ্রদায়ের উপর অপর সম্প্রদায়ের বিজয়ের বার্তা বহন করেছিল।(19) দুই রাষ্ট্রের যৌথ উদ্যোগের বদলা বদলি খেলায় নারীরা হয়ে গিয়েছিলেন বাজারের পণ্যবস্তু।(20) যখন উদ্ধার অভিযান শুরু হয় তখন অপহৃত বা ধর্ষিত নারীদের অধিকাংশই ইতিমধ্যেই তাদের সন্তানদের জন্ম দিয়ে ফেলেছেন। পাকিস্তান সরকারের কাছে তাদের জন্য কোনো যথাযথ নিয়মকানুন ছিল না। তবে ভারত সরকার ঘোষণা করে যে, অপহৃত নারীদের যে সন্তানরা পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করবে ,তারা পাকিস্তানের নাগরিক হবে এবং সেখানেই থাকবে। অন্যদিকে, যে নারীরা ভারতে অপহৃত হয়েছিলেন এবং পাকিস্তানে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন ,তারা তাদের সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে।(21) এই ঘোষণার ফলে নিজ নিজ মায়েদের সাথে সাথে তাদের শিশুদের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। যে নারীদের সন্তান সহ পাকিস্তানে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তারা এই ভেবে ভীত হয়ে পড়ল যে, পাকিস্তানের সমাজ তাদের গ্রহণ করবে না। অন্যদিকে ভারতীয় নারীদের ক্ষেত্রে, এই নীতিটি মা ও সন্তান উভয়ের জন্য বিচ্ছেদের মানসিক আঘাত তৈরি করায়

অমানবিক বলে বিবেচিত হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভারতীয় মায়েরা তাদের সন্তানদের ছেড়ে যেতে রাজি ছিলেন না। এই পরিস্থিতিতে উক্ত সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করা হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে, ভারতীয় মহিলাদের সন্তানরা তাদের মায়ের সঙ্গে ভারতে আসতে পারবে। তবে কিছুদিন পর মা সিদ্ধান্ত নেবেন যে, তিনি তার সন্তানদের নিজের সঙ্গে রাখবেন ,নাকি তাকে পাকিস্তানে বাবার পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আজও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, শারীরিক নির্যাতনের ভয়ে নারীরা নিজেদের নাম প্রকাশ করতে ভয় পায়। জলপাইগুড়ি জেলায় এক সাক্ষাৎকারে একই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা জানা গেছে। এক মহিলা (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে 2021) প্রথমে নিজের নাম প্রকাশে অরাজি ছিলেন, কোনো ভাবে তার গল্প বলতে রাজি হন। তিনি দেশভাগের শিকার হয়েছিলেন। 1948 সালে আন্দোলনের সময় মুসলমানদের দ্বারা তিনি অপহৃত হন। তার পরিবার কোনোমতে তার বড় বোনকে বাঁচাতে পারলেও তাকে পারেনি। সাড়ে তিন মাস বন্দি থাকার পর তাকে বিয়ে করতে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু তার মন কখনো এই ভাগ্য মেনে নেয়নি। এবং অবশেষে দুই বছর পর তিনি সুযোগ পান। যখন পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল এমন একটি হিন্দু পরিবারের সঙ্গে তার দেখা হয়। কোনোভাবে তিনি তাদের রাজি করিয়ে তাদের সঙ্গে ভারতে পালিয়ে আসেন। ভারতে পৌঁছে তিনি নিজেকে গর্ভবতী আবিষ্কার করেন। ফলে তার বেঁচে থাকার পথ আরও কঠিন ও দুরূহ হয়ে ওঠে। তিনি ভারতে নিজের পরিবারের খবর পাওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তিনি একাই তার সন্তানের জন্ম দেওয়ার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী সিদ্ধান্ত নেন এবং আর বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি একটি স্বচ্ছল হিন্দু পরিবারের গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং এখনও সেই পরিবারের সাথেই বসবাস করছেন।

হারানো উঠোনের খোঁজে : বাংলা সাহিত্যে বাস্তুহারা নারীর স্মৃতিকাতরতা : -
মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা দেশভাগের কারণ, ও উদ্বাস্তু সমস্যা তার প্রতিফলন মাত্র। গল্প ও উপন্যাসগুলি সেই কলঙ্ক জনক অধ্যায়ের অভিশপ্ত দলিল। বাংলার দেশভাগ অনেকদিন ধরে বহমান বলে তাকে বলা হয় ' লং পার্টিশন '। বাংলা কথা সাহিত্যে গল্প,উপন্যাস ও কবিতায় দেশ ভাগ তথা উদ্বাস্তু বাঙালি নারীদের জীবন সংগ্রাম, মানসিক সংকট এবং সামাজিক রূপান্তর অত্যন্ত জোরালো ভাবে ফুটে উঠেছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্জুন' উপন্যাসে দেশভাগের পর কলকাতায় আসা এক উদ্বাস্তু পরিবারের টিকে থাকার লড়াই এবং নারীদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের চিত্র

ফুটে উঠেছে। তাঁর ' পূর্ব - পশ্চিম উপন্যাস দুই বাংলার সীমানা নির্ধারণের পর নারীদের মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয় ও উদ্বাস্তু শিবিরের কঠিন বাস্তবতার দলিল। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তীর 'প্রান্তিক মানব' উপন্যাসে নারীদের অবর্ণনীয় দুর্দশা চিত্রিত হয়েছে। শক্তিপদ রাজগুরুর 'দণ্ডকারণ্য থেকে মরিচঝাঁপি ' উপন্যাসে দণ্ডকারণ্য ও মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু শিবিরে নারীদের অবর্ণনীয় কষ্ট ও জীবন যুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। মহীতোষ বিশ্বাসের 'পরতাল ' উপন্যাসে ক্যাম্প - কলোনির চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে ইতিহাসের অনুষঙ্গে। পূর্ব বাংলার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কেউ বা হারিয়েছে স্বামী,কেউ বা বাবাকে। এদের অনেকেরই রয়েছে পালাক্রমে ধর্ষিতা হওয়ার নির্মম অভিজ্ঞতা। শোকে - দুঃখে, অপমানে এদের কেউ কেউ নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছে।কেউ বা হয়ে উঠেছে খ্যাপাটে,হিংস্র ও প্রতিশোধপরায়ণ। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ' নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে ' উপন্যাসে দেশভাগের পটভূমিতে নারীদের ভিটেমাটি হারানোর বেদনা ও উদ্বাস্তু জীবনের সূচনাপর্ব উল্লিখিত হয়েছে। নারায়ণ সান্যালের ' বৈতরণী ' তে শিয়ালদহ স্টেশনে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তু পরিবার এবং সেখানে নারীদের সামাজিক ও শারীরিক নিরাপত্তার সংকটের বিবরণ রয়েছে। প্রতিভা বসুর ' নষ্ট নীড় ' ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তু নারীদের মানসিক টানাপোড়েন ও মানিয়ে নেওয়ার লড়াই লক্ষ্যণীয়। সতীনাথ ভাদুড়ীর ' ছেঁড়া তার ' গল্পে উদ্বাস্তু শিবিরের পটভূমিতে নারীদের অসহায়ত্ব ও নৈতিক সংকট প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। দক্ষিণারঞ্জন বসুর ' ছেড়ে আসা গ্রাম ' স্মৃতিকথাতে পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসতে বাধ্য হওয়া মানুষের স্মৃতিকথা, যেখানে নারীদের নিজগৃহ হারানোর হাহাকার স্পষ্ট। মনিকুন্তলা সেনের ' 'অন্তহীন প্রেরণা ' গল্পে দেখা যায় উদ্বাস্তু শিবিরে নারীদের পুনর্বাসন ও তাদের স্বাবলম্বী হওয়ার আন্দোলনের রাজনৈতিক ইতিহাস। আশাপূর্ণা দেবীর 'মিত্তির বাড়ি ',মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতার স্বাদ ', প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়া পাতার নৌকা ',প্রতিভা বসুর 'সমুদ্র হৃদয় ' প্রভৃতি গ্রন্থে নোয়াখালী দাঙ্গা এবং সংকট বিধ্বস্ত সমাজের মধ্যে নারী জীবনের লড়াই এখানে আলাদা গুরুত্ব পায়। দেশভাগ পরবর্তী বাঙালি সমাজের অবধারিত ভবিতব্য বাঙালি মেয়েদের এই লড়াই। শক্তিপদ রাজগুরুর 'মেঘে ঢাকা তারা ',সাবিত্রী রায়ের 'বদ্বীপ ' আজিজুল হকের 'আগুন পাখি ', মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা একটি কবিতায় বলেছেন -

"এসে দেখে যাও কুটি কুটি সংসার

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের ছড়ানো বে - আব্রু সংসারে

স্বামী নেই,গেল কোথায় তলিয়ে

ভেসে এসে আজ ঠেকেছে কোথায় ও - যে

ছেঁড়া কানিটুকু কোমড় জড়ানো আদুরী, ঘরের বউ

আমার বাংলা।"

মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের সংকট কীভাবে একজন সাধারণ নারীকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তার রূপক ও বাস্তব সম্মত প্রকাশ, রবিন গাঙ্গুলী,কবি কৃত্তিবাসের লেখায় দেশভাগের সময় নদীপার হওয়া,ট্রেনের ছাদ বা শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেওয়া নারী যাদের কোল থেকে শিশু কেড়ে নেওয়া হয়েছে,কিংবা যারা সর্বশান্ত হয়েছেন,উদ্বাস্তু নারীর মনস্তত্ত্ব ও শারীরিক নির্যাতনের ইঙ্গিত মিলেছে। 'মেঘে ঢাকা তারা ','সুবর্ণ রেখা ', 'কোমল গান্ধার ', 'কলকাতা ৭১' প্রভৃতি চলচ্চিত্রে উদ্বাস্তু নারীদের অসহায়ত্ব প্রকটিত হয়েছে। যেমন 'মেঘে ঢাকা তারা ' ছবিতে নীতার জীবন কাহিনী বর্ণীত হয়েছে।

উদ্বাস্তু নারীর রান্নাঘর : চেনা স্বাদের খোঁজে অচেনা লড়াই : - উদ্বাস্তু নারীদের খাদ্যাভ্যাস চরম অভাব,তীব্র সংগ্রাম এবং অতুলনীয় সৃজনশীলতার মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল। এই বাস্তুচ্যুত নারীদের খাদ্যাভ্যাস মূলত বেঁচে থাকার লড়াই এবং ফেলে আসা স্মৃতির মেলবন্ধন ছিল। কলোনি বা ক্যাম্পের জীবন শুরুর দিনগুলোতে উদ্বাস্তুদের খাদ্যের প্রধান উৎস্য ছিল সরকারী রেশন। মোটা চাল, আটা এবং ডালই ছিল তাদের দৈনিক খাবারের মূল উপাদান। নারীরা এই সীমিত এবং নিম্ন মানের সামগ্রী দিয়েই পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। তীব্র খাদ্য সংকটের কারণে উদ্বাস্তু নারীরা রান্নার ক্ষেত্রে কোনো কিছুই অপচয় করতেন না। সবজির খোসা, ডাঁটা,পাতার মতো অংশ যা সাধারণত ফেলে দেওয়া হয়, সেগুলো দিয়ে তারা অত্যন্ত সুস্বাদু চচ্চড়ি, ছেঁচড়া এবং বাটা তৈরি করতে শুরু করেন। লাউ খোসা ভাজা বা কুমড়োর ছাল রান্না করার মতো অভ্যাস এই সময়ে আরো বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। লাউ দিয়ে যেমন ঘণ্ট হতো, আবার একই সঙ্গে হতো লাউয়ের খোসা ভাজা। কমদামি বা বিনামূল্যে আশেপাশে পাওয়া যায় এমন উপাদান নারীরা বেছে নেন। যেমন - কচুর শাক, কচুর লতি,ওল এবং নানা ধরনের বুনো শাক। তীব্র অর্থকষ্টের কারণে আমিষ বা প্রোটিনের জোগান দেওয়া কঠিন ছিল। অনেক সময় পুরো পরিবারের জন্যে মাত্র একটি ডিম জুটত। মায়েরা সেই একটি ডিমকে সেদ্ধ করে বা ভেজে ছোট টুকরো

করে, তার সাথে প্রচুর আলু যোগ করে কারি বা ঝোল বানাতেন। যাতে পরিবারের সবাই অন্তত এক টুকরো করে অংশ পায়। শত অভাবের মধ্যেও নারীরা তাদের পূর্বপুরুষদের রান্নার স্বাদ ও পদ্ধতি ধরে রাখতে চাইতেন। ওপার বাংলার বিখ্যাত ঝাল ও মশলাদার রান্না , শুঁটকি মাছ এবং বিভিন্ন পিঠাপুলির ঐতিহ্য তারা সীমিত সম্পদের মধ্যেই ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন, যা পরবর্তীতে এপার বাংলার খাদ্য সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছিল। কলোনী গুলিতে দম্পতি নারী - পুরুষ ও তাদের ছেলেমেয়েরা সকলে হাতে হাত লাগিয়ে হোগলার বেড়া, বাঁশের খুঁটি দিয়ে এক কামড়ার মাথা গোঁজার ঘর তুলেছিল। বেড়া দিয়ে চৌহদ্দি সীমানা করে বাড়ির মেয়েরা তুলেছিল লাউ,কুমড়োর লতা। পুকুর থেকে কলমির শাক, হিংচে শাক জোগাড় করে বহুদিন পরে স্বাদ বদলের চেষ্টা করেছিল উদ্বাস্তু মা - ঝি - বউরা। সেদিন দুঃখের ভাত অমৃত হয়ে উঠেছিল বহুদিন অখাদ্য খাওয়া মানুষগুলোর নিকট। কলোনিতে অতিবাহিত কষ্টের জীবনে স্থানাভাবের চেয়ে খাদ্যাভাবের কষ্ট ছিল বড় প্রবল। তবু সবকিছুকে মানিয়ে মা - মেয়ে - বউ সকলে মিলে দুঃখের ভাত হাসিমুখে পরিবেশন করতে দ্বিধা করত না।

সোমন্তী ঘোষ সম্পাদিত "দেশভাগ : স্মৃতি ও স্তব্ধতা" গ্রন্থে অরবিন্দ নগর,বিজয়গড় কলোনির বাসিন্দা উজ্জ্বলা চক্রবর্তী সেই উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণা অকপটে স্বীকার করেছেন। "আমার বিয়ে হয়েছিল পঞ্চাশ সালে। আমার তখন কত বয়স ? চোদ্দ হবে। ওরা নোয়াখালীর। তখন বলত মেয়ে তুলে নিয়ে বিয়ে করা। আমার হয়েছিল তাই...এসে উঠলাম অরবিন্দ নগর কলোনিতে। বিরাট সংসার, সব মিলিয়ে ষোলো - সতেরো জন। জল খাবারে রুটি তরকারি হতো....তারপর রান্নাবান্না - ডাল,তরকারি,তিতা,মাছ...খেতে খেতে সাড়ে তিনটে তিনটে। তখন আর তরিতরকারি বেশি থাকত না। ওই জন্য করতাম কি,রান্না হওয়ার পরে সবজির যত খোসা - টোসা থাকত, সেগুলি দিয়ে চচ্চড়ি মত বানাতাম.... ওইটা আমরা জায়েরা খেতাম। রাতে অনেকসময় বড় জা তেঁতুল - চিনি দিতেন। ওই মেখে খেতাম। সন্ধ্যেবেলার খাবার চা,মুড়ি... মাঝে মাঝে নারকেল কোরা। রেশনে চাল পেতে সমস্যা হচ্ছিল। আমার শ্বশুর ছিলেন উদ্বাস্তু পরিবারের এবং আমার পিসি শ্বাশুড়ি প্রমুখের নিকট শুনেছি যে, তাদের ওইটুকু বিলাসী খাদ্যও একসময় জুটত না। একবেলা আধপেটা খেয়ে থেকেছে। আলুর খোসা ভাজা দিয়ে সকালে ভাত খেলে রাতে আর পাতে একটি কি দুটি রুটি পড়তো। একবেলা ফ্যান জুটলে অন্যবেলস্তু জল খেয়ে কাটানো হতো।

কপির পাতা থেকে কুমড়োর দানা কিছুই ফেলা যেত না। বাস্তুহারা জীবনের ঘর গেরস্থালির অতি সাধারণ থেকে নিম্নমানের খাদ্য ব্যঞ্জনের বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয় টানাটানির সংসারে মেয়েদের সহনশীল কর্মপটুতার ও পরিবার পরিজনকে আপ্রাণ ভালো রাখার চেষ্টা। একটা সময় সারা বাজার ঘুরে বেড়িয়ে মাঝবেলায় বাজারের পড়তি ঝড়তি জিনিস ,একটু পেট ফোলা মাছ, মুরগী, পাঁঠার নাড়িভুঁড়ি, গলা, মাথা এমনকি পুকুর থেকে ধরা গেড়ি গুগলি কিনে এনে সন্তানদের মুখে ছদ্ম খাবার তুলে দিতে হতো। সেদিনও মা দিদিমারা পুরোনো দিনের সুখের স্মৃতি বুকে চেপে ধরে সেই সব অখাদ্য গুলিকে তাদের অন্নপূর্ণার হাতের ছোঁয়ায় খাদ্যে পরিণত করেছেন। আর্থিক অনটনের কারণে তাদের সহজাত অভ্যাস তৈরি হয়ে যায়,সবজির সবটুকু দিয়ে রান্না করার। কিছু যাতে ফেলা না যায় সেদিকে নজর রাখা।

উদ্বাস্তু শিবিরের অন্ধকার অধ্যায় : - উদ্বাস্তু নারীদের জীবনে প্রধানত তিন ধরনের সমস্যা ছিল, -

(i)অর্থনৈতিক সমস্যা

(ii) বাসস্থানের সমস্যা

(iii) নারীর আব্রুর সমস্যা

এই সময় ভারত সরকারের

তরফে একাধিক উদ্বাস্তু শিবির খোলা হয়েছিল। এই শিবীরগুলি আবার তিনভাগে বিভক্ত ছিল,

(i) ট্রানজিট ক্যাম্প

(ii) মহিলা আশ্রয়কেন্দ্র

(iii) স্থায়ী দায় আশ্রয় কেন্দ্র।(22)

দ্বিতীয় ধরনের আশ্রয় কেন্দ্রে থাকতো বিধবা,পঙ্গু ও অসহায় মহিলারা। তৃতীয় প্রকার আশ্রয় কেন্দ্রে বৃদ্ধা,নাবালিকা এবং অভিভাবকহীন মহিলারা থাকতেন। নাম থেকেই স্পষ্ট এরা ছিলেন সরকারের কাছে বোঝা স্বরূপ, এবং পুরোপুরি সরকারি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। উইমেন্স ক্যাম্প বা মহিলা শিবিরে অনাথ বিধবা ও অভিভাবকহীন মেয়েদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। মহিলাদের পুত্র সন্তানেরা আঠেরো বছর বয়স

পর্যন্ত উইমেন্স ক্যাম্পে থাকতে পারত। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে উদ্বাস্তুদের নিয়ে যাওয়া হতো সরকারের অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরে (ট্রানজিট ক্যাম্পে)। যতদিন তাদের স্থায়ী আশ্রয় শিবিরে স্থানান্তর না করা হতো ততদিন তারা সেখানে বসবাস করত। ক্যাম্প গুলির অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়, না ছিল আব্রু, না ছিল কোনো গোপনীয়তা। পরনের কাপড় টাঙিয়ে খানিকটা আড়াল সৃষ্টি করে আব্রু রক্ষার এক প্রকার ব্যর্থ প্রচেষ্টা নারীরা করতেন। এরই মধ্যে নবজাতক জন্মাচ্ছে : বিবাহ মৃত্যু সবই ঘটছে। একটিমাত্র চটের দেয়ালের ওপাশে ছেলে - ছেলের বউ , এ পাশে বাবা, মা ও বোনেরা। স্নান ঘরে কিংবা শৌচালয়ে আবডাল নেই। এরই মধ্যে পাশাপাশি বড় হয়ে উঠছে ছেলে মেয়েরা। কাজ কর্মহীন জীবনের ভয়াবহ অবকাশ কাটে কুৎসিৎ পরচর্চা,নারী চর্চা আর যৌন আলোচনায়। কিশোরী ও যুবতী মেয়েরা কখনও বাইরে,কখনও ঘরে কমুক পুরুষের লালসার শিকারে পরিণত হয়। আবার কখনো তারা পাচার হয়ে গিয়েছে নিষিদ্ধ জগতে। কেউ কেউ সস্তা সুখের আশায় শরীরকে পণ্য করে ছেড়েছে।(23) শিশুরা নূন্যতম শিক্ষার সুযোগ পায়নি। কারণ বেঁচে থাকতে গিয়ে পেটের দাবিকে সবার আগে পূরণ করতে হয়েছিল। সরকারি সাহায্যের একটি বিরাট অংশ কর্মকর্তাদের পকেটে গিয়েছে। যেটুকু উদ্বাস্তুদের কাছে এসে পৌঁছেছে, তাকে কেন্দ্র করে নিজেরাই নানা ধরনের দুর্নীতির পথ অবলম্বন করেছে। বিবাহিত কন্যাকে স্বামী পরিত্যক্তা বলে অতিরিক্ত সাহায্য দাবি করা। কলোনি গুলিতে বিপন্ন নারীর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাদের সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে সুযোগ সন্ধানী পুরুষেরা। কখনো তার শরীরকে পেতে সরাসরি এসেছে টাকার প্রস্তাব, কখনো কোনো সতর্কবার্তা ছাড়াই তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। দেশান্তরী নারীকে নানা কৌশলে তাদের শরীরকে পণ্য করতে বাধ্য করা হতো। দৈনিক রেল স্টেশনে মেয়ে চালান যেত, তারা ফিরত ভোরের বাসে। কলোনি গুলিতে অনেকসময় মেয়েদের ছলনার আশ্রয় নিতে হয়। নিজেদের বাস্তব পরিচয় লুকিয়ে ধরতে হয়েছে বিধবার বেশ। দেশীয় পুরুষ অনেকে উদ্বাস্তু নারীদের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলেও বিবাহের মাধ্যমে সামাজিক স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করত, মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগত। একটা সাধারণ রিফুজি মেয়ে, সাত ঘাটের জল খেয়ে এসে ঠেকেছে ক্যাম্পে। ক্যাম্প থেকে একটা উদ্বাস্তু মেয়েকে নিয়ে কোন মুখে, কোন লজ্জায় দাঁড়াবে বাড়িতে। বিভিন্ন সরকারি শিবির গুলিতে নারীরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। একটি ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে যেখানে টিটাগড় মহিলা শিবির নং 1 থেকে 18 জন নারী শরণার্থীর একটি দলকে কোনো ভাতা

না দিয়েই মেদিনীপুর শিবিরে স্থানান্তর করা হয়েছিল। তারা তাদের দাবির জন্য অনশন ধর্মঘট শুরু করেন।(24) নদীয়ার ধুবুলিয়া শিবিরেও সরকার সক্ষম শরণার্থীদের ভাতা বন্ধ করে দেওয়ায় একজন মহিলা অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। প্রায় 300 জন নারী শরণার্থী তাদের দাবি আদায়ের জন্য রেললাইন অবরোধ করেছিলেন। বেশিরভাগ মহিলা শিবিরে আবাসনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। যার ফলে ভাসমান নৌকায় অস্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। টিটাগড় ক্যাম্প নং - 1 এ 2100 জন মহিলার সাথে 1603 জন নাবালক, ক্যাম্প নং - 2 এ 1032 জন মহিলার সাথে 444 জন শিশু ছিল।।(25) মহিলা শিবিরের অবস্থা শিবিরের শরণার্থীদের মধ্যে ব্যাপক অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল। মেদিনীপুর সালভা শিবিরে সরকারের অবহেলার কারণে, প্রায় 300 শিশু এবং 1000 জন মহিলা দিনের পর দিন অনাহারে ছিলেন। যার ফলে কিছু শিশুর মৃত্যু হয়েছিল। ম্যালেরিয়া,আমাশয় ও সাপের কামড়ে ভুগতেন এবং অনেক নারী ও শিশুর মৃত্যুও হয়েছিল।(26) স্থায়ী দায়বদ্ধতা (পি এল) শিবিরের অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন নারী, যারা অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় জীবন - যাপন করছিলেন। তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থার অভাব ছিল। এমনকি নারীদের কাজের উদ্দেশ্যে শিবিরের বাইরে যাবার অনুমতি ছিল না। এই নিয়মগুলি লঙঘনের ফলে তারা শিবিরের মৌলিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতেন। অবশেষে তারা নিয়ম মেনে চলার ও সরকার কর্তৃক অপ্রতুল ও অপর্যাপ্ত অনুদানের উপর নির্ভর করে জীবন কাটাতে বাধ্য হন, যা নারী শরণার্থীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে স্বনির্ভর হতে বাধা দিচ্ছিল।(27) পুষ্টিকর ও উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে এই সময়ে শিশু মৃত্যুর হারও যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ধুবুলিয়া ক্যাম্পের একজন উদ্বাস্তু মহিলার বক্তব্য স্মরণ করা যায়। যিনি বলেছেন , - "বড় দুঃখের দিন গেছে। শত শত শিশু আমাশয়ে মারা গেছে... গোটা ক্যাম্পে সন্তানহারা নারীর আর্তনাদ। সে সময় থাকলে দেখতে পেতেন রাস্তার দুপাশে সার বেঁধে শিশু কোলে নিয়ে মেয়েরা কাঁদছে, অপেক্ষা করছে কখন ট্রাক আসবে, মৃত শিশুদের সৎকার করতে নিয়ে যাবে।" সাধারণত একেবারে ছোট শিশুর মৃতদেহগুলি মাটিতে পুঁতে দেওয়া হতো, তবে অনেকসময় এগুলোকে জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হতো পশুখাদ্য হবে বলে। অমানুষিক এই পরিস্থিতি সকল উদ্বাস্তুর জন্য অভিশাপস্বরূপ হলেও মায়ের জাতি মেয়েদের জন্য এর মাত্রা ছিল আরো বেশি। কারণ : -

প্রথমত : - একজন গর্ভবতী নারী যার সন্তান হয়ত ভবিষ্যতে ভারতের একজন নাগরিক হয়ে উঠেছে, কিন্তু ক্যাম্পের এমন দুঃসহ পরিস্থিতি সেই নারী এবং তার ভেতরে বেড়ে ওঠা সন্তানের যে মানসিক ক্ষতি করেছে আগামী দিনে তার প্রভাব অবশ্যই শিশুটির ভবিষ্যত জীবন এবং পরোক্ষ দেশের উপর পড়েছে।

দ্বিতীয়ত : - অতি প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবার একান্ত অভাবের মধ্যে সন্তান জন্ম দেওয়া একজন প্রসূতি মায়ের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর কিরকম বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তৃতীয়ত : - দুর্নীতির ফলে অপুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ এবং এর ফলে অপুষ্টি,আমাশয় ইত্যাদির ফলে বহু শিশুর প্রাণ অকালে ঝড়ে যায়। মা হিসেবে একজন নারীর কাছে এরচেয়ে পীড়াদায়ক হয়তো আর কিছু হয় না। উদ্বাস্তু শিবীরগুলিতে অবৈধ যৌন সম্পর্ক ,অদ্‌ভুত বিবাহ, পতিতাবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই প্রসঙ্গে একজন ক্যাম্পবাসীর বক্তব্য উল্লেখ করা যায়, -"আমরা আর মানুষ ছিলাম না, আমাদের আচরণ পশুর মত হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝেই এইরকম ঘটনা ঘটত। আমরা জানতেও পারতাম না কার মশারির ভেতর কে শুচ্ছে। "সতীত্ব বিষয়টি নারী ও সমাজের চাহিদার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু অভাব নারীর সতীত্বের ওপর করাল থাবা বসায়। নারী স্বেচ্ছায় দেহ ব্যবসায় নিমজ্জিত হয়েছে এমন উদাহরণ রয়েছে। কখনো একজন নারী একমুঠো কয়লা, কিছু পয়সা বা একটা কাপড়ের বিনিময়ে নিজেকে বিক্রি করত এমন উদাহরণও বিরল নয়।(28) বেশিরভাগ ত্রাণ শিবিরে মৌলিক সুবিধার অভাব ছিল। দীপেশ চক্রবর্তীর লেখা 'স্মৃত গ্রাম : দেশভাগের পর হিন্দু বাঙালি স্মৃতির উপস্থাপনা ' তে তিনি একটি সাক্ষাৎকারের কথাও উল্লেখ করেছেন, যেখানে একজন শরণার্থীকে বলতে শোনা যায়, - "আমি আজ এই কলকাতা শহরের একজন বাস্তুহারা, আমি ত্রাণ শিবিরে থাকি। এই শিবিরের কেউ কেউ কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে। আজ সকালে যখন আমি একমুঠো চিঁড়ে পেলাম, তখন বসন্ত রোগে একটি বাস্তুহারা শিশু মারা গেল। আমি সেই ত্রাণ বাবুর কাছে যাওয়ার সাহস করিনা, আমি কিছু বলতে গেলেই তিনি রেগে যান। আমি জিজ্ঞাসা করি না কেন এমনটা হয়েছে"। এই উক্তিটি সেই নির্দিষ্ট সময়ে উদ্বাস্তুদের অবস্থা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিল। জলপাইগুড়ির ফালাকাটা থানার অন্তর্গত ইন্দিরা কলোনিতে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তু সরলারানী দাস (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার) একজন কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ করার তার সেই করুণ স্মৃতি স্মরণ করেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাকে এই বলে

ধমকে দেন, - " তোমরা তো শ্বশুরবাড়ি আসোনি, বেশি কথা বললে ঘার ধরে বের করে দেব।" হিন্দু - মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পুরুষদের লালসার শিকারে পরিনত হয় নিরপরাধ মেয়েরা। তবে বাংলা ও পাঞ্জাবে ছিন্নমূল মেয়েদের নির্যাতনের চরিত্রগত ভিন্নতা লক্ষণীয়।(29) দুই প্রদেশের গৃহহীন নারীর পুনর্বাসন কিংবা ত্রাণ প্রকল্পে পক্ষপাতদুষ্ট সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে।(30)

রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পে শরণার্থী শিবির

সূত্র: https://www.anandabazar.com/events/independence-day/was-the-day-of-freedom-completely-independent-dgtl-1.456368

পাঞ্জাবী উদ্বাস্তু নারীর নানান সুযোগ সুবিধা প্রদান ছিল বাংলার তুলনায় অধিক।(31) ত্রাণ শিবীরগুলিতে নারীরা নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। উদয় রানী দত্ত (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার) 2020 জলপাইগুড়ির তালমা রিভার সাইড কলোনিতে তার শিবিরের দিনগুলির কথা স্মরণ করেন। যেখানে অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি, জল, খাবার ও বস্ত্রের অভাব এবং অনিয়মিত রেশনিং ব্যবস্থা তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল। দুধের অভাবে কিছু শিশু মারা গিয়েছিল। এছাড়া কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণে মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছিল। আর এই ধরনের মৃতদেহ দাহ করার কোনো সঠিক ব্যবস্থা ছিল না। তার কাছে প্রতিটি দিনই দুঃস্বপ্নের মতো মনে হতো। তখন তার বয়স ছিল দশ বছর। তুষার সিং নারীদের দুর্ভোগের এক করুন কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনা অনুযায়ী ভদ্রকালী শরণার্থী মহিলা শিবিরে নারী নির্যাতনের একটি ঘটনা ঘটেছিল। 1954 সালের 19 ও 20 অক্টোবর, একদল বহিরাগত সেই মহিলাদের উপর শারীরিক নির্যাতন চালায়। পরবর্তীকালে তাদের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।সেই পুরুষদের গ্রেপ্তার করার পরিবর্তে, নির্যাতিত মহিলাদের আত্মীয়দের কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। বহু যুবতী ও কিশোরী জীবনকে

অন্ধকারের পথে ঠেলে দেওয়ার জন্য সেই সমাজ বিরোধীরাই দায়ী ছিল। 1956 সালের 10 ই ফেব্রুয়ারি আবারও একদল লোক রাতে ভদ্রকালী শিবিরে হামলা চালিয়ে দশজন মহিলাকে নির্মমভাবে নির্যাতন করে। পুলিশ বাহিনী সাধারণত এই ধরনের বিষয়ে নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করত। এই শারীরিক সহিংসতার প্রতিবাদে সুবর্ণা সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তারা সরকারের কাছে বেশ কিছু দাবি পেশ করেন। কিন্তু সরকার তাতে মোটেও উৎসাহ দেখায়নি। বরং এবিষয়ে তাদের আরও অগ্রগতি রোধ করতে শিবিরটিতে প্রশাসকরা শাস্তি স্বরূপ আন্দোলনকারীদের অনুদান বন্ধ করে দেয় এবং 17 টি পরিবারের ভাতা বন্ধ করে দেয়। যা প্রতিবাদ আন্দোলনকে আবারও জোরদার করে তোলে। 1956 সালের 15ই মে উত্তরপাড়ায় আরেকটি সভার আয়োজন করা হয়। যেখানে কুঞ্জ দাশগুপ্ত, ঊষা নাগ, সরযৌবালা বাল, প্রাণকুঞ্জ চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন হাজরার মতো কিছু নেতা উপস্থিত ছিলেন। কিছুদিন পর পুলিশ সেই শিবির থেকে দশজন মহিলাকে গ্রেপ্তার করে, যথা সরযৌবালা বাল, শেফালী দাস, কস্তুরী বিশ্বাস, প্রিয়বালা দে এবং লক্ষ্মী দাস। দুর্ভাগ্যবশত 1957 সালের 11 ই মার্চ ভদ্রকালীর মহিলাদের উপর আরেকটি হিংস্র আক্রমন চালানো হয়। শিশুদের বাঁকুড়ার পিয়ারাডোবা শিবিরে স্থানান্তর করা হয়েছিল। মায়েরা জেল থেকে ফিরে এসে তাদের ছেলে মেয়েদের খুঁজে পায়নি। হারানো সন্তানদের সাথে দেখা করার দাবীতে তারা অনশনের পথ বেছে নেয়। ইউনাইটেড সেন্ট্রাল রিফিউজি কাউন্সিল (UCRC) পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য উদ্যোগ নেয় এবং মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে একটি প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। শ্রী তুষার সিং এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মহিলারা 61 দিন পর্যন্ত অনশন চালিয়ে যান। 61 দিন পর UCRC - র সচিব অম্বিকা চক্রবর্তী দাবির একটি তালিকা নিয়ে ডঃ রায়ের সঙ্গে পুনরায় দেখা করেন এবং তিনি একটি সমাধান নিয়ে আসার আশ্বাস দেন (ইউ সি আর সি, 1958 : 19)।(32) তবে শেষ পর্যন্ত সরকার এই বিষয়ে তেমন আগ্রহ দেখায়নি। বদলি হওয়া মেয়েদের ফিরিয়ে আনা হয়নি। শ্রীমতী সরযৌবালা বালও দীর্ঘ সময় ধরে বহিষ্কৃত ছিলেন।(33) উদ্বাস্তু নারীদের জায়গার অভাবে তাদের পক্ষে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত পরিসর পুরুষদের সাথে ভাগকরে নিতে হতো, শ্বশুর বাড়ির লোকজন এবং দেবরদের সাথে একই ঘরে ঘুমোতে হতো।(34) এমন নয় যে, একটি পরিবারকে সম্পূর্ণ একটি আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে একই জায়গায় অন্যান্য পরিবারের সাথে মানিয়ে নিতে হয়েছিল, যা সকলের জন্য বিশেষ

করে নারী সদস্যদের জন্য কঠিন ছিল। গর্ভবতী নারীদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হতো না।(35) নারীরা কেবলমাত্র অন্য সম্প্রদায় বা বিপরীত লিঙ্গের দ্বারাই নয়, বরং নিজ সম্প্রদায়ের মানুষ এমনকি নারীদের দ্বারাও নির্যাতিতা হতেন। তাদের মানসিক নির্যাতনের কোনো সীমা ছিল না। মানসী দেবী (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার - 2021) যিনি মূলত বরিশালের বাসিন্দা ছিলেন এবং 1968 সালে সতেরো বছর বয়সে জলপাইগুড়িতে আসেন। তিনি সমাজের কাছ থেকে অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুর আচরণের শিকার হয়েছিলেন। স্থানীয় মহিলারা তাদের অবজ্ঞা করত এবং এমন আচরণ করত যেন... তারা অস্পৃশ্য ছিল। দেশভাগের স্মৃতিতে এটাই ছিল তার জন্য সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক অংশ। তিনি আরোও বলেনযে, তুলনামূলক ভাবে বেশি কৌতূহলী কিছু মহিলা তাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করতেন দেশের বাড়িতে তারা কোনো ধরনের শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে কিনা।(36)

নিঃস্বতার মাঝে শক্তি : শিবিরে উদ্বাস্তু নারীদের নেতৃত্ব,আত্মবিশ্বাস ও ক্ষমতায়ন : - জবরদখল কলোনি গঠনের জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীদের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট সক্রিয়। কলোনি বাঁচানোর জন্য উদ্বাস্তু নারীরা রণরঙ্গিনী রূপ ধারণ করে। তাদের ভেতরে থাকা সুপ্ত অগ্নি লেলিহান শিখায় পরিণত হয়। কলোনির মেয়েরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে - করো হাতে ধারালো ছ্যান দা, কারো হাতে সড়কি, কারো হাতে বঁটি, কারো হাতে কুড়োল। কলোনির মেয়েদের এই সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ পরবর্তীকালে সামাজিক অধিকার ও প্রতিষ্ঠা পাবার ক্ষেত্রে বিশেষ কাজ করেছে। কমিউনিস্টরা তাদের দলের প্রধান শক্তি স্থল হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছে কলোনি গুলিকে। প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেত্রী মনিকুন্তলা সেনের কথায় এই সত্যতার প্রমাণ মেলে - "প্রায় প্রত্যেকটি কলোনিতে গিয়েছি মহিলা সমিতি গড়তে, এবার কলোনি গুলি থেকে পেতে লাগলাম নিত্য নতুন সাথী। এইসব কলোনিতে গড়ে উঠতে লাগলো নিত্য - নতুন মহিলা সমিতি ও কর্ম কেন্দ্র। এক একটা কলোনি যেন এক একটা সংগ্রাম দুর্গ "।(37) ক্রমে এই আন্দোলনের সাথে কমিউনিস্টদের একটি শক্তিশালী সংযুক্তিকরণ ঘটেছিল। 1950 সালে যাদবগড় এলাকায় পুলিশ ও শিবিরের শরণার্থীদের মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষ হয়। পুলিশের লাঠিচার্জের ফলে বীণাপাণি মিত্র নামে এক গর্ভবতী মহিলা মারা যান। বীণাপাণি পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী আন্দোলনের প্রথম নারী শহীদ ছিলেন।(38) ' পশ্চিমবঙ্গ সমাজসেবী সংঘ ' হাওড়া ময়দানে শরণার্থীদের জন্য কর্মরত অন্যতম

একটি ত্রাণ সংস্থা ছিল। বেঠিয়া শিবির থেকে ফিরে আসা শরণার্থীরা সংস্থার দেওয়া চালের পরিমাণে সন্তুষ্ট ছিলেন না। মহিলারা আরোও বেশি পরিমাণ খাবারের দাবি জানান, যা সংঘটি উপেক্ষা করে। অবশেষে একদল মহিলা পশ্চিমবঙ্গ সমাজসেবী সংঘের কাছ থেকে তিন বস্তা চাল ছিনিয়ে নেয়। একজন সরকারি কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে আসেন এবং মহিলাদের দ্বারা শারীরিক ভাবে লাঞ্ছিত হন। বেঠিয়া শিবির থেকে ফিরে আসা ব্যক্তিরা তাদের দাবি আদায়ের জন্য সত্যাগ্রহেরও আয়োজন করেন, যেখানে বহু মহিলা ও শিশু অংশগ্রহণ করেন। এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, শরণার্থী মহিলারা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার সাহস দেখিয়েছিলেন। (39) দণ্ডকারণ্য বিরোধী আন্দোলনে লাঠিচার্জের শিকার হওয়া সত্ত্বেও বর্ধমান জেলার নারী শরণার্থীরা এগিয়ে যান, এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদেন।(40) উদ্বাস্তু নারীদের মানসিক যন্ত্রণা এবং তাদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম বহু উপন্যাস ও চলচ্চিত্রে চিত্রিত হয়েছে। জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁর স্মারক গ্রন্থ 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা ' তে এক হিন্দু উদ্বাস্তু মেয়ের যন্ত্রণা ও মানসিক কষ্টের কথা বর্ণনা করেছেন, যা নারীর সম্মানহানি ছাড়াও সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন। সাবিত্রী রায়ের মহাকাব্যিক উপন্যাস 'স্বরলিপি ' প্রধানত নারীদের বেঁচে থাকার সংগ্রামকে তুলে ধরেছে। এতে উচ্ছেদ বিরোধী বিল, হিন্দু কোডবিল, শান্তি আন্দোলন ইত্যাদির বিরুদ্ধে নারীদের সংগ্রাম চিত্রিত হয়েছে। এই উপন্যাসটি তাদের বস্তি এলাকা রক্ষার জন্য নারীদের সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে লড়াইয়ের বর্ণনা দেয়। উপন্যাস ছাড়া অনেক চলচ্চিত্রেও উদ্বাস্তু সমস্যা চিত্রিত হয়েছে। যেমন, ছিন্নমূল, ঋত্বিক ঘটকের ত্রয়ী (মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার, সুবর্ণ রেখা) যেগুলিতে কিছু কাল্পনিক চরিত্রের মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত নারীদের সংগ্রামকে তুলে ধরা হয়েছে। শিবিরের পাশবিক জীবন - যাপনে উদ্বাস্তুরা একসময় হাঁপিয়ে ওঠে। সেখানে হওয়া দুর্নীতি, সরকারের খেয়াল খুশি মত যত্রতত্র স্থানে পুনর্বাসনের নামে উদ্বাস্তুদের প্রেরণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করে। এই ধরনের আন্দোলনে কেবলমাত্র পুরুষেরাই নয়, উদ্বাস্তু নারীরাও সামিল হয়। পরিবারের শান্ত গৃহকোণে আবদ্ধ অবলা নারীরা এই সময় যথার্থ সহযোদ্ধার মতো পুরুষদের পাশে এসে দাঁড়ান। এই সময় নারীরা হাতা, খুন্তি, ঝাঁটা ইত্যাদি নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে সশস্ত্র পুলিশের বিরুদ্ধে এগিয়ে এসেছেন। এমনকি শঙ্খকে তারা কেবল পূজার ঘরে নয় সচেতনতা প্রেরণের বার্তাবহ যন্ত্র হিসেবেও ব্যবহার করেছেন। অনুরূপ বর্ণনা সাবিত্রী রায় রচিত 'স্বরলিপি ' উপন্যাসেও রয়েছে, যেখানে লেখিকা লিখেছেন,-" যেই কলোনি আক্রমণ করে ভাড়াটে গুন্ডারা,

অমনি বিপদের সংকেত হিসেবে মেয়েদের শাঁখ বেজে ওঠে ঘরে ঘরে। এক একটা কলোনি যেন সংগ্রামের দুর্গ হয়ে উঠেছিল। পুলিশ বা গুণ্ডা বাহিনীরা কলোনি উচ্ছেদ করতে এলে পুরুষেরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেও কলোনির মেয়েরা দলবদ্ধভাবে সতর্ক পাহারায় থাকতো"। উদ্বাস্তু আন্দোলনের সূত্র ধরে সাধারণ পরিবারের নারীরাও রাজনীতির অনেকটা কাছাকাছি চলে আসেন। উদ্বাস্তু আন্দোলনের সপক্ষে হওয়া সভা - সমিতি ও মিছিলে নারীরাও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যোগদান করতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে 1954 সালে বান্ধবগড় কলোনিতে মহিলা সমিতির সভায় প্রায় 200 নারীর অংশগ্রহণ, 1954 সালের 10 ই আগস্ট কাশিপুর উদ্বাস্তু ট্রানজিট ক্যাম্পে বৃদ্ধা ননীবালা ভট্টাচার্য্যের 11 দিন যাবৎ বিভিন্ন অভাব অভিযোগের প্রতিকারের দাবিতে অনশন, 1956 সালের 6 ই জুলাই হুগলি জেলার ভদ্রকালী উদ্বাস্তু শিবিরের মহিলাদের দ্বারা কলকাতার ওয়েলিংটন স্কয়ার থেকে লরেন্স রোড পর্যন্ত সংঘটিত মিছিলে মহিলা নেত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ও নারীদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। শান্ত গৃহকোণে আবদ্ধ নারীরা উদ্বাস্তু জীবন - যাপন করতে গিয়ে ধীরে ধীরে নিজেদের দাবি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করেছিলেন। দীর্ঘ কাল বামপন্থী আন্দোলনের সহিত যুক্ত মনিকুন্তলা সেন স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তু নারীদের এক জাগরণ দেখেছেন। তাঁর ভাষায় পূর্ব বাংলায় থেকে গেলে হয়তো মেয়েদের এই পরিবর্তন আসতো না। দেশান্তরী নারী সময়ের দাবিকে সামনে রেখে দ্রুত নিজের বদল ঘটিয়েছে, পাশাপাশি বদলে দিয়েছে তার চারপাশের সমাজকে। জীবনসংগ্রামে উদ্বাস্তু মেয়েরা যেভাবে এগিয়ে এসেছিল, তাতে কেবল ওই ছিন্নমূল মানুষেরা পায়ের তলার মাটি খুঁজে পায়নি, সাধারণ ভাবে পশ্চিমবঙ্গের নারীমুক্তির পথ উন্মোচিত করেছিল। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর "বারো বকুল ঘর এক উঠান" উপন্যাসে অসংখ্য নারী চরিত্রের সমাগম ঘটে এবং দেখা যায় বীথি, বকুল, কমলারা ঘরের গণ্ডি ছেড়ে শুঁড়িখানায় কাজ করতে থাকে। অভাব , দারিদ্র্য আর সীমাহীন সংকটকে সঙ্গী করেই উপন্যাসের রমণীরা এক উঠোনকেই বাস্তবতা হিসেবে মেনে নেয়। জ্যোতির্ময়ী দেবীর "এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা" উপন্যাসে সকিনার মায়ের কণ্ঠে তাই শোনা যায়, - " তোমাদের দেশভাগ চাই, ঝগড়া করবে করো, আমাদের মেয়েদের মান, ইজ্জত, শরীর নিয়ে এ লাঞ্ছনা কেন? একি তোমাদের ধর্মে বলে, কোরানে আছে কি? তোমরা এত শিক্ষিত উকিল, মোক্তার, মাস্টার কেউ কাউকে কিছু বলছেনা কেন? ছিঃ ছিঃ নারীত্বের চরম অবমাননা "।(41) মেয়েরা সেদিন পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কলোনি উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন ও সংগ্রামে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিল। যে সব

জমিতে জবরদখল কলোনি গড়ে উঠেছিল, সেখানে জমির মালিকেরা পুলিশ ও গুণ্ডার সাহায্যে হামলা করালে মেয়েরা সর্বস্ব দিয়ে প্রতিবাদ করেছে। 'স্বরলিপি ' উপন্যাসে সাবিত্রী রায় এভাবে বর্ণনা দিয়েছেন - "যেই আক্রমণ করে ভাড়াটে গুন্ডারা অমনি বিপদের সংকেত হিসেবে মেয়েদের শঙ্খ বেজে ওঠে ঘরে ঘরে। এক একটা কলোনি যেন সংগ্রামের দুর্গে পরিণত হয়ে উঠেছিল। পুলিশ বা গুণ্ডা বাহিনীরা কলোনি উচ্ছেদ করতে এলে পুরুষেরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেও কলোনির মেয়েরা দলবদ্ধভাবে সতর্ক পাহারায় থাকতো "।(42) এ প্রসঙ্গে প্রফুল্ল চক্রবর্তীর লেখাটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তিনি বলেছেন, " The women volunteers stood in the van against the assault of police. Behind then stood the male volunteers, and the children brought up the rear ".(43)1950 এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে উদ্বাস্তু কলোনিগুলি লাল দুর্গে পরিণত হয়। এই সময় বামপন্থী ও বিরোধী দলগুলি রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের পুনর্বাসন নীতি ও গুণ্ডাবাহিনীর কলোনি উচ্ছেদের তীব্র বিরোধিতা করে আন্দোলন গড়ে তোলে। পারিবারিক দায় - দায়িত্বের পাশাপাশি অল্প বয়সী মেয়েদের আপদ বিপদ থেকে রক্ষা, কিংবা পুলিশি অভিযানের সময় কলোনির তরুণদের আশ্রয় দেওয়ার কাজ করতে থাকে। 'মেঘে ঢাকা তারা ' র নিতার মা কিংবা অশোক মিত্রের 'ক্যালকাটা ডায়েরী ' সেই বৃদ্ধা আমাদের নজর কাড়ে, কলোনি উচ্ছেদ বিরোধী কার্য কলাপের মধ্যে দিয়ে।(44) নিজেদের দাবি দাওয়া মেটাতে উদ্বাস্তু মেয়েরা পুনর্বাসন নীতির বিরুদ্ধে কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় সভা, মিছিল এমনকি সশস্ত্র প্রতিরোধ ও আন্দোলন করতে থাকে। এবং এই প্রতিরোধ ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের সামনে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পথ সুগম হয়।(45) ' মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ' হাত ধরে কমিউনিস্ট দলের কাছেও চলে আসে বহু মেয়ে। কমিউনিস্ট মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মাধ্যমে উদ্বাস্তুদের বিশেষত মহিলাদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রচার করে হিন্দু মহাসভাকে প্রতিহত করেন। অন্যদিকে শিক্ষাঅর্জন, রাজনীতি চর্চা, ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপে অংশগ্রহণ উদ্বাস্তু মহিলাদের নিয়মানুবর্তী জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। উদ্বাস্তু সংগঠন ইউ.সি.আর.সি মহিলা উদ্বাস্তুদের কলোনি উচ্ছেদ বিরোধী প্রতিরোধ অন্দোলন ও মিছিলের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। "Indeed it may not be an exaggeration to say that it was U.C.R.C wich first brought women in such large numbers into the streets of Calcutta."(46) নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে উদ্বাস্তু মেয়েরা জীবন পর্যন্ত বাজি ধরে প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল। 1949 সালের 27 শে

এপ্রিল বস্তুহীন নারীদের পুনর্বাসিত সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহেরু তাঁর বক্তৃতায় বলেন - " পূর্বাপেক্ষা অনেক অধিক সংখ্যক নারী বর্তমানে জনসভায় অংশগ্রহণ করিতেছে দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। বাস্তুহারাদের পুনর্বসতিই বর্তমানের সর্ব প্রধান সমস্যা। সরকার জনগণ ও বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের নারী শাখা সমূহ এই অসহায় নারীদের পুনর্বসতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। তথাপি প্রয়োজনের তুলনায় এই সাহায্য অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে"।(47) 1954 সালে বান্ধবগড় কলোনিতে মহিলা সমিতির এক সভা হয়, যাতে দুই শতাধিক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্তা প্রেমলতা বসুর উপস্থিতিতে সভায় স্বর্ণলতা সরকার, রেণুকা সরকার তাদের বক্তব্যে সরকারের কলোনি উচ্ছেদ বিষয়ক নোটিশের তীব্র নিন্দা করেন। এবং এই আদেশ রদ করার জন্য সংগ্রামের আহ্বান জানান।(48)

সূত্রঃ https://www.itihasadda.in/movement-of-bengali-ladies/

1961 সালের 24 নভেম্বর দুর্গাপুরের বর্ধমান জেলা উদ্বাস্তু পরিষদের পরিচালনায় দুর্গাপুর বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন, যার মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন শ্রীমতী নির্মলা বর্ধন।(49) এরপর আবার 24 ডিসেম্বর মায়ারানী নামক জনৈক মহিলার পরিচালনায় উদ্বাস্তুরা আইন অমান্য করেন। অন্যদিকে উত্তর 24 পরগনার হাবড়া, কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জে উদ্বাস্তুরা পুনর্বাসনের দাবিতে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন এবং দুইজন মহিলা গ্রেপ্তার হন।(50) হুগলী জেলার ভদ্রকালী উদ্বাস্তু শিবিরের মহিলারাও 1956 সালের 6 ই জুলাই কলকাতার ওয়েলিংটন স্কয়ার থেকে লরেন্স রোডে মিছিল করে নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য।(51) আবার 1961 সালের 13 ডিসেম্বর বর্ধমানের কাকসা ক্যাম্প কলোনি উচ্ছেদ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এক

সভা হয়, যাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন শ্রীমতী সরস্বতী দাশ, শান্তি মৈত্র প্রমুখরা।(52) উদ্বাস্তু নারীদের কলোনি উচ্ছেদ বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনের চিত্র তৎকালীন বাংলা উপন্যাসেও লক্ষ্য করা যায়। অমিয় ভূষণ মজুমদারের ' নিরবাস ' উপন্যাসের মালতীর কথা বলা যায়। যে দন্ডকারণ্যে না যাবার জন্য ক্যাম্পের মানুষকে সংগঠিত করেন। পরতল উপন্যাসে কুর্পাস ক্যাম্প সুপার বৈশাখী ব্যানার্জী রেশনের পচা চাল খেতে বাধ্য করলে সমবেতভাবে উদ্বাস্তু নারীরা তার প্রতিবাদ করে। রামচন্দ্র সেনের ' পূব থেকে পশ্চিমে ' উপন্যাসে দেখা যায় কলোনি গঠনের সময় জমির মালিক পুলিশ এবং গুন্ডাদের দিয়ে জমি উদ্ধার করতে চাইলে মহিলার শাঁখ বাজিয়ে পাহারারত পুরুষদের সতর্ক করে দিয়েছে। আবার কলোনি থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে তারাই কলকাতার রাজপথে মিছিলে নেমেছে। সাবিত্রী রায় তাঁর 'স্বরলিপি ' উপন্যাসে দেখিয়েছেন - উদ্বাস্তু মেয়েরা কলোনি স্থাপন ও তার বিরুদ্ধে পুলিশি প্রতিরোধের মোকাবিলা করেছে। অনেকে আবার শিশু ক্রোড়ে নিয়ে প্রতিবাদে রাস্তায় বেরিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু মেয়েরা কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলার ক্যাম্প কলোনির প্রতিরোধ অন্দোলন দমন করতে সরকারি নির্মমতা উগ্ররূপ ধারণ করেছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 24 পরগনার ক্যানিং উত্তর ভাগের বেতবেড়ে ওয়ার্ক সাইট ক্যাম্পের কথা বলা যায়, যেখানে পুলিশ উদ্বাস্তু নারীদের উপর চার রাউন্ড কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়ে ও নির্দয়ভাবে লাঠিচার্জ করে। অন্যদিকে 1955 সালের 16 ই জুলাই হাবড়ায় উদ্বাস্তুরা বিভিন্ন দাবিতে মিছিল করলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং এতে 22 জন মহিলা আহত হন। শ্রমলক্ষী কলোনির মেনকা সুন্দরী নামক জনৈক বৃদ্ধা ঘটনা স্থলেই অচেতন হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।(53) কংগ্রেসি সরকার অসহায় উদ্বাস্তু নারীদের রক্ত ঝড়ায়, কিন্তু তাতেও উদ্বাস্তু নারীদের প্রতিরোধ আন্দোলনকে দমন করতে সক্ষম হয়নি।(54)

উদ্বাস্তু নারীদের উদ্ধার : সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ : - সরকার শরণার্থীদের সামর্থ অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করে শিবিরগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছিল। সন্তানসহ বৃদ্ধা বা বিধবা, যারা তাদের পরিবারের দেখাশোনা করতে অক্ষম ছিল, সরকার তাদের মহিলা উদ্বাস্তু শিবিরে স্থানান্তর করেছিল। এই ধরনের শিবির 24 পরগনার টিটাগড় ও কার্তিকপুর, নদীয়ার রানাঘাট, হুগলির বাঁশবেড়িয়া ও ভদ্রকালীতে খোলা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী শিবিরগুলির মধ্যে বৃহত্তম নদীয়ার ধুবুলিয়া শিবিরের একটি

অংশ শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। সেই সময়ে জমির অভাবও পরিলক্ষিত হয়েছিল, যার ফলে মহিলা শরণার্থীরা বাবুঘাট বন্দর কমিশনের অধীনে যাত্রীদের অপেক্ষা কক্ষে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পুনর্বাসন সহায়তা ছাড়াও সরকারি শরণার্থী ছেলে ও মেয়ে উভয় শিশুদের শিক্ষা ঋণ মঞ্জুর করে এক বিশেষ ধরনের শিবির বরাদ্দ করেছিল, সেটির নাম দেওয়া হয়েছিল ' হোম '। সরকার এই শিশুদের যথাযথভাবে শিক্ষিত করার কথা ভেবেছিল, যাতে তারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে এবং তাদের পরিবারের দেখাশোনা করতে পারে। মেয়েদের জন্য দুটি ' হোম ' খোলা হয়েছিল ; যার মধ্যে একটি ছিল 24 পরগণার রিজেন্ট পার্কে এবং অন্যটি হুগলির উত্তর পাড়ায়। পূর্বেরটি মধ্যবয়সী শরণার্থী মহিলাদের জন্যও বরাদ্দ করা হয়েছিল, যারা বয়ন, সেলাই, সাবান তৈরি ইত্যাদির মতো বিভিন্ন হস্তশিল্পের কাজে জড়িত ছিলেন।(55) এই ভাবে কলকাতা এবং আশেপাশে অনেক মহিলা হোম ও শিবির নির্মিত হয়েছিল। এই উদ্যোগটি সরকার হঠাৎ করে নেয়নি ; শরণার্থী মহিলাদের বহু সংগ্রাম ও আন্দোলন এই ধরনের উন্নতির জন্য দায়ী ছিল। বাস্তুহারা মেয়েদের জন্য অপেক্ষা করে মানবাধিকারের প্রতিটি প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চনা। অপহৃতা ও নির্যাতিতা হয়ে বাস্তুচ্যুত নারী এক পুরুষ হতে অন্য পুরুষের হাত বদল হয় পণ্যের ন্যায়। তাদের শরীর পুরুষের আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হতে বাধ্য হয়।(56) 1975 সালে উদ্বাস্তু মেয়েদের সামগ্রিক উন্নতি বিধানে প্রথম আন্তর্জাতিক মহিলা বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মেক্সিকোতে, এবং সালটিকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ রূপে চিহ্নিত করা হয় ও সমগ্র বিশ্বের নারী সমতার ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। আর এক্ষেত্রে উদ্বাস্তু মেয়েদের বিষয়টি সর্বাধিক প্রাধান্য পায়।(57) পাঞ্জাবের তৎকালীন গভর্নর ইভান জেনকিন্সকে লেখা মিঃ নেহেরুর 4 এপ্রিল 1947 তারিখের একটি চিঠিতে বলা হয়েছে যে, - "তবে একটা বিষয় আছে যার প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, আর তা হলো অপহৃত বা জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত নারীদের উদ্ধারের প্রশ্ন। আপনারা উপলব্ধি করেন যে, নারী অপহরণের গল্পের চেয়ে আর কোনো কিছুই জনমনে উত্তেজনা বাড়ায় না, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এই নারীদের উদ্ধার করা না হবে , ততক্ষণ পর্যন্ত অশান্তি দানা বাঁধতে থাকবে এবং হয়তো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে"।(58) পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি হয়তো এক নয় , কিন্তু নারীদের দুর্ভোগের ক্ষেত্রে তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। নারীরা সবাই নির্যাতিতা হতেন, শুধুমাত্র নারী হওয়ার কারণে। সরকারের পক্ষ থেকে প্রথম উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছিল মিরাটে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের 23-25 নভেম্বর 1946 সালের অধিবেশনে, যেখানে

একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। কংগ্রেস কলকাতা, পূর্ববঙ্গ, বিহার এবং মিরাট জেলার কিছু অংশের মর্মান্তিক ঘটনাগুলিকে বেদনা, আতঙ্ক ও উদ্বেগের সাথে দেখছে। সাম্প্রদায়িক সংঘাতের এই নতুন ঘটনা প্রবাহ পূর্ববর্তী যে কোনো গোলযোগ থেকে ভিন্ন এবং এতে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, গণধর্মান্তর, নারী অপহরণ ও ধর্ষণ এবং জোরপূর্বক বিবাহের মতো ঘটনা ঘটেছে। যে নারীদের অপহরণ করে জোরপূর্বক বিবাহ দেওয়া হয়েছে, তাদের অবশ্যই নিজ নিজ বাড়িতে ফিরিয়ে দিতে হবে। গণ ধর্মান্তরের কোনো বৈধতা নেই এবং মানুষকে তাদের পছন্দের জীবনে ফিরে আসার জন্য সব ধরনের সুযোগ দিতে হবে। 1947 সালের 17 ই নভেম্বর, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি একটি প্রস্তাব পাশ করে, যাতে বলা হয়েছিল...এইসব গোলযোগের সময় উভয়পক্ষ থেকে বিপুল সংখ্যক নারীকে অপহরণ করা হয়েছে এবং ব্যাপক আকারে জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণও ঘটেছে। কোনো সভ্য জাতিই এই ধরণের ধর্মান্তকরণকে স্বীকৃতি দিতে পারে না, এবং নারী অপহরণের চেয়ে জঘন্য আর কিছুই নেই। সংশ্লিষ্ট সরকারগুলোর সহযোগিতায় নারীদেরকে তাদের নিজ গৃহে ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। (59) সীমান্তের উভয়দিকেই কিশোরী ও যুবতী নারীরাই প্রধানত লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল এবং সেই কারণেই উদ্ধার অভিযানের সময় উদ্ধারকৃতদের তালিকায় তাদের সংখ্যাই সর্বাধিক। অপহৃত ব্যক্তির সনাক্তকরণ, অপহৃত নারীদের সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে উদ্ধারকারী কর্মকর্তা ও পুলিশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল, এতে কোনো সন্দেহ ছিলনা যে, সরকার শরণার্থীদের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্যই এই উদ্যোগগুলো নিয়েছিল। তবে পরবর্তীকালে এটি নারীদের জন্য শাস্তিস্বরূপ প্রমাণিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই নারীরা ইতিমধ্যেই সেই পুরুষদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, যাদের দ্বারা তারা অপহৃত হয়েছিলেন। অবশেষে তারা মা হন এবং একটি স্থিতিশীল জীবন শুরু করেন। তাদের পক্ষে মন থেকে সেই ভয়াবহ স্মৃতিগুলো মুছে ফেলা প্রায় অসম্ভব ছিল। তাই সরকারের উদ্ধার অভিযানের সময়, তারা আবার তাদের নতুন পরিবার থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে শুরু করেন। যা তাদের উপর হওয়া হয়রানির এক ধরনের পুনরাবির্ভাব বলে তাদের মনে হয়েছিল। তারা এর প্রতিবাদ করে বলেছিল, - " কেন আমাদের আলাদা করছেন, সেই পুরোনো দিনগুলো মনে করে কি লাভ?"(60) দুই দেশের যৌথ উদ্ধার অভিযানে বেশ কিছু সংখ্যক নারীকে উদ্ধার করা হয়েছিল। কিন্তু এটি প্রকৃতপক্ষে তাদের সতীত্ব ও মর্যাদাবোধে আঘাত হেনেছিল। কিছু ক্ষেত্রে তাদের অনিচ্ছার কারণ ছিল যে, তারা ইতিমধ্যেই তাদের জীবনে সেই

দুঃখজনক ঘটনার সাথে মানিয়ে নিয়েছিল এবং সেখানে একটি সুখী জীবন যাপন শুরু করেছিল। কিছু নারী যারা ফিরতে অস্বীকার করেছিল, তারা এর পথ বেছে নিয়েছিল - অনশন। সুস্থ হয়ে ওঠা এক তরুণী মৃদুলা সারাভাইয়ের মুখোমুখি হয়ে বলেন যে, - "আপনি বলেন অপহরণ অনৈতিক, তাই আমাদের বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। মানুষ জীবনে একবারই বিয়ে করে, সে স্বেচ্ছায় হোক বা জোর করে। আমাদের তো এখন বিয়ে হয়েই গেছে, আপনি আমাদের নিয়ে কী করবেন? আমাদের আবার বিয়ে করতে বলবেন? এটা কি অনৈতিক নয়? আমাদের যখন অপহরণ করা হয়েছিল, তখন আমাদের আত্মীয়দের কী হয়েছিল? তারা কোথায় ছিল? .... আপনি যদি জেদ করেন করুন, কিন্তু মনে রাখবেন আপনি আমাদের মেরে ফেলতে পারেন কিন্তু আমারা যাবো না"।(61) এই মহিলারা ভালোভাবেই অবগত ছিলেন যে,- পরিবারের সাথে তাদের আগের স্নেহপূর্ণ সম্পর্ক আর আগের মতো থাকবে না। তাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ, একজন মুসলমানকে বিয়ে করা এবং সন্তান জন্ম দেওয়া তাদের নিজেদের মূল পরিবারের কাছে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য হবে। এরা জানতেন যে, তাদের পৈতৃক পরিবারের কাছে একই ধর্ম ও বর্ণের পুরুষের সাথে একটি বিয়ে সম্মানজনক হলেও , ভিন্ন ধর্মের পুরুষের সাথে বিয়ে বা দ্বিতীয় বিয়ে অত্যন্ত লজ্জাজনক হবে। তাছাড়া উদ্ধার অভিযানের প্রধান ব্যক্তিদের দ্বারা তাদের মাতৃত্বের প্রশ্নটি তখনও অমীমাংসিতই রয়ে গিয়েছিল। কেবল নারীরাই যে নিজেদের পরিবারের কাছে ফিরতে অস্বীকার করেছিল তাই নয়, তাদের পরিবারগুলোও নিজেদের হারানো সদস্যদের ফিরিয়ে নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল। এইভাবে নারীরা দুইভাবেই নির্যাতিতা হয়েছিল।

প্রথমত - ভিন্ন সম্প্রদায়ের পুরুষদের দ্বারা, যারা তাদের উপর শারীরিক নির্যাতন চালাত।

দ্বিতীয়ত - তাদের নিজেদের পরিবার বা সম্প্রদায়ের দ্বারা, যারা তাদের মানসিকভাবে হয়রানি করত। পরিবারকে বিষয়টি বোঝানোর জন্য 1948 সালের 17 ই জুলাই, নেহেরু হিন্দুস্থান টাইমসের মাধ্যমে জনগণের কাছে একটি আবেদন জানান, - " আমি শুনেছি যে,- অপহৃত মেয়ে ও নারীদেরকে তাদের ঘরে ফিরিয়ে নিতে আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে অনিচ্ছা রয়েছে। এটি একটি অত্যন্ত অপত্তিকর ও ভুল মনোভাব এবং যে কোনো সামাজিক প্রথা যা এই মনোভাবকে সমর্থন করে, তার অবশ্যই নিন্দা করা উচিৎ। এই মেয়ে ও নারীদের আমাদের কোমল ও স্নেহপূর্ণ যত্ন প্রয়োজন এবং

তাদের আত্মীয়দের উচিৎ তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে সব ধরনের সাহায্য করতে গর্ববোধ করা"।(62) অপহৃত নারীদের অনেকের কাছেই উদ্ধার অভিযানটি ছিল দ্বিতীয়বারের মতো বাস্তুচ্যুতি। তাদের অনেকেই এই উদ্ধার অভিযানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করেছিলেন। তারা সেখানে যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কারণ তারা জানতেন যে, তাদের পরিবার ও সমাজ তাদেরকে মন থেকে গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। অপহৃত নারীদের রক্ষা করার পরিবর্তে, উদ্ধার ব্যবস্থাগুলো তাদের যন্ত্রণা ও দুর্ভোগ বাড়িয়ে দিয়েছিল। উদ্ধার হওয়া অনেক নারীকে আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কারণ তাদের পরিবার তাদের গ্রহণ করেনি। তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই তাদের কাঙ্ক্ষিত পারিবারিক জীবন পাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। কখনো কখনো ব্যক্তিগত বাড়িতেই উদ্বাস্তু নারীদের অন্য প্রদেশের অপরিচিত ব্যক্তিদের সাথে বিয়ে দিতে বাধ্য করা হতো। দেশভাগের পর একটি দিক হলো অপহৃত নারীদের পুনর্বাসন। সরকারের তরফ থেকে 1957 র সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান ও ভারত থেকে মহিলা ও শিশুদের উদ্ধারের ব্যবস্থা হলেও ভারত ও পাকিস্তান দুই সরকার চেষ্টা করেও অপহৃত ও হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের ফিরিয়ে আনা বা পুনর্বাসনের ব্যাপারে ততখানি সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয় নি।(63) স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতের মেয়েদের জীবনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকীতে যেমন নারী কল্যাণমূলক কর্মসূচীকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। তেমনি দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ এই তিনটি পরিকল্পনাতেও মহিলা তৃণমূল স্তরের কল্যাণ ও মহিলা মণ্ডলকে শক্তিশালী করার কথা বলা হলেও কর্মক্ষেত্রে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পুনর্বাসন প্রকল্প সংক্রান্ত সরকারি উদ্যোগ ছাড়াও বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থাও উদ্বাস্তু সংক্রান্ত পুনর্বাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। যেমন - উদয়ভিলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল হোম, মহিলা সেবা সমিতি, নারী সেবা সংঘ, আনন্দ আশ্রম, অল বেঙ্গল উইমেন্স হোম ইত্যাদি। এই সংস্থাগুলি উদ্বাস্তু নারীদের জন্য উপযুক্ত আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে তাদের দেখাশোনা শুরু করে। নারীদের বাটিকের কাজ, কাপড় বোনা, সুচিকর্ম, ব্লক প্রিন্টিং, বয়ন, বই বাঁধাই, সাবান তৈরি ও নানা কুটির শিল্প শেখানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। এছাড়াও নারী শরণার্থীদের জন্য একটি কর্মজীবী নারী হোস্টেল, নার্সারী স্কুল, ছাপাখানা, প্রশিক্ষণ ক্যান্টিং এবং শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অডিটোরিয়াম নির্মাণ করা হয়েছিল। সমাজকর্মী অশোকগুপ্ত দেশভাগের সময় নারী শরণার্থীদের সহায়তার জন্য 'মহিলা সেবা সমিতি ' প্রতিষ্ঠা করেন। এরা নারী শরণার্থীদের সংকট নিয়ন্ত্রণে এবং তাদের সমাজের মূল ধারায় পৌঁছাতে সাহায্য করার

ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।(64) উদয়ভিলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল হোম কলকাতার নিকটবর্তী কামারহাটিতে অবস্থিত ছিল এবং এটিকে একটি সমবায় সমিতি হিসেবে গ্রহণ করা হতো। এই সংস্থাটি প্রধানত সেইসব উদ্বাস্তু নারীদের জন্য কাজ করত, যারা পূর্ব পাকিস্তানে তাদের পরিবার ছেড়ে এসেছিলেন বা হারিয়েছিলেন এবং একা সীমান্ত পার হয়েছিলেন। এই সংস্থাটি বীণা দাসের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি মূলত একটি বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান ছিল। প্রশিক্ষণ শেষে তারা বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত হতেন। নারীরা পারিশ্রমিক এবং লাভের একটি অংশও পেতেন।(65) এটিও লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে, উদ্বাস্তু নারীরা এই সংস্থা থেকেই বিয়ে করতেন এবং পরিবারের কাছ থেকে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন সহ্য করার পর আবার ভিলাতে ফিরে যেতেন।(66) কলকাতার এলিয়ট রোডে বেঙ্গল উইমেন্স হোম অবস্থিত ছিল। এই আবাসটি মূলত ধর্ষণ বা অপহরণের মানসিক আঘাতে জর্জরিত নারীদের জন্য নির্মিত হয়েছিল। তাদের বিশেষ যত্ন ও চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল, যা তাদের মূলধারায় ফিরে আসতে সহায়ক হয়। 1947 সালের ডিসেম্বরে ভারত ও পাকিস্তানের যৌথ প্রচেষ্টায় অপহৃতা নারীদের উদ্ধারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। 1949 সালের ডিসেম্বরের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে 12000 নারীকে উদ্ধার করা হয়। কিন্তু সেই নারীদের অনেকেই ততদিনে স্থিত হয়েছে পারিবারিক জীবনে। এই অবস্থায় তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল বিভীষিকার স্মৃতিকে ভুলে যাওয়া।(67)

ছিন্নমূল তবুও অদম্য : শরণার্থী নারীদের ঘুরে দাঁড়ানোর ইতিহাস : - বহু আন্দোলন ও প্রতিবাদের পর, নারী শরণার্থীরা অবশেষে 'অন্দরমহল ' সংস্কৃতির গতানুগতিক ধারণা ভেঙে দেন। তারা বিভিন্ন আর্থিক খাতে যোগ দিয়ে অর্থনৈতিক বোঝা ভাগ করে নিতে শুরু করেন। পরিবারের বাধা স্বত্ত্বেও নারীরা জীবন ধারণের জন্য ব্যাংকের চাকরিতে যোগদেন। খাদ্য বিভাগ, টেলিফোন, এক্সচেঞ্জ অফিস এমনকি পুলিশ খাতে তাদের সম্পৃক্ততা অর্থনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনে, যা পশ্চিমবঙ্গের নারীদেরও একই কাজ করতে প্রভাবিত করে।(68) উদয়ভিলা মহিলা সমবায় বা নারী সেবা সংঘের সহায়তায় নারীরা দর্জিগিরি, বই বাঁধাই, বাটিক প্রিন্টিং এর প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন।এমনকি ফার্স্ট ফুড সেন্টারও শুরু করেছিলেন। স্বল্প শিক্ষিত মহিলারা ফুল, ফল ও সবজি বিক্রি, অফিসে খাবার সরবরাহ অথবা গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতেন। এই ধরনের আর্থিক স্বাধীনতা তাদের মানসিক অবস্থার উন্নতি

ঘটিয়েছিল। শিক্ষা ও আর্থিক খাতে তাদের সম্পৃক্ততা তাদের বিবাহ থেকে বিরত রেখেছিল।(69) দমদমের সরোজিনী নাইডু কলেজে অনেক উদ্বাস্তু মহিলা ভর্তি হচ্ছিলেন। প্রধানত পুরুষেরাই ছিল সংসারের উপার্জনশীল। সংসারের অন্দরের দায়িত্ব সামলাতো মেয়েরা। দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে যৌথ পরিবারে ভাঙন শুরু হয়। একই পরিবারের সদস্যরা জীবিকার প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া পরিবারের সকল পুরুষের আয়ও সমান ছিল না। এই অসম উপার্জন পরিবারের মধ্যে ভেদরেখা তৈরি করে।(70) নতুন পরিবেশে এসে সংসারের টানা পোড়েনে শুধুমাত্র পুরুষের উপার্জনে সংসার চলছিল না। ফলে পরিবারের একাধিক সদস্যসহ মেয়েরা কাজে নেমে পড়ল। যারা ইতিপূর্বে বাড়ির বাইরে বেড়িয়ে কাজ করেনি, তারা বাঁচার তাগিদে নানা পেশায় যোগ দিল। সেই সঙ্গে ভাঙল দীর্ঘদিনের মানসিক অবরোধ। পূর্ববঙ্গের মানুষ যে জগৎ চিনত তার অবসান হলো মূলত 1947 থেকে 1950 এর মধ্যে। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত যাত্রা অভিনেত্রী জ্যোৎস্না দত্ত ও বীণা দাসগুপ্তার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বাস্তুচ্যুত হওয়ার ফলে অর্থের প্রয়োজনে তারা এই পেশা অবলম্বন করে।(71) হোমের পাশাপাশি সৃষ্টি হয়েছিল orphanage home বা অনাথ আশ্রম। ইংরেজ শাসনের সূচনাপর্ব থেকে সমাজে অবৈধ সন্তানদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য মানবিক কারণে orphanage home সৃষ্টি হয়েছিল। তবে তার সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। স্বাধীনতা সময়কালে পিতৃ পরিচয়হীন সন্তানের সংখ্যা অসম্ভব রকম বেড়ে যায়। সেজন্য সরকারি - বেসরকারি অনাথ আশ্রম স্থাপনের প্রয়োজন হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সমাজের দ্বারা উপেক্ষিত ধর্ষণজাত এই সন্তানদের একটি বড়ো অংশ সমাজবিরোধী বা মস্তান নামে পরিচিতি পেয়েছিল।(72) পূর্ববঙ্গীয় সমাজ কাঠামোয় যে নারী ছিল অন্দরে সে সদরে বেরিয়ে এলো স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর। সংসারের প্রয়োজনে বাধ্য হয়েই সে কাজে নামল। মুক্তির পথে, আত্মবিশ্বাসের পথে, মেয়ে হিসেবে আত্মপরিচয় পাওয়ার এই পদক্ষেপ। ' Reintegrating the Displaced Refracting the Domestic ' প্রবন্ধতে বোলান গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন - পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মধ্যবিত্ত নারীদের যে রক্ষণশীল পারিবারিক অবস্থান এতদিন ছিল, পরিস্থিতির চাপে তার পরিবর্তন ঘটল। এই পরিবর্তন ছিল মৌলিক। তারা সংসারের লক্ষ্মণরেখার বাইরে পা দিয়ে বৃহত্তর জীবনে অংশ নিতে শুরু করল। ফলে পারিবারিক জীবনে নতুন আদর্শ গড়ে ওঠে।(73) দেশভাগ না হলেও দেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে বাইরের কাজের জগতে মেয়েদের অনুপ্রবেশ ঘটতই, কিন্তু সেই প্রবেশকে ত্বরান্বিত করেছে দেশান্তর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সময় থেকেই অর্থনৈতিক তাগিদে মেয়েরা অন্তঃপুরের বাইরে

কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিল। উদ্বাস্তু নারীরা এই প্রবেশকে ত্বরান্বিত করেছিল। গ্রামের অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মহিলারা প্রধানত কাজের তিনটি ক্ষেত্রকে বেছে নেয়। যথা,-

(i) কৃষিক্ষেত্রে শ্রমের বিনিয়োগ

(ii) গৃহভৃত্যের কাজ

(iii) বিড়িবাঁধা সহ ছোট খাটো জাতের কাজ

1961 সালেও কর্মরত নারী শ্রমিকের শতকরা 58 জন কৃষি জীবিকায় সংলগ্ন দেখা গেছে। পরবর্তী সময়ে পশ্চিম বাংলার অর্থনীতিতে নারীর শ্রম কৃষিকাজ অথবা গৃহ ভৃত্যের কাজ এই দুইয়ের যে কোনো একটি অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।(74) কলোনির শিক্ষিত মেয়েরা শিক্ষকতার দায়িত্ব নেয়। কলোনি পরিচালনার জন্য কমিটি গঠিত হলে অনেকে নেত্রী হয়ে ওঠে। জীবিকার প্রয়োজনে কলোনির অনেক মেয়েদের বেছে নিতে হয়েছে অ - সামাজিক পথ, দেহকে সম্বল করে অফিস যাবার নাম করে বেরিয়ে পরতে হয়। কত বালিকা, কিশোরী পড়াশোনা বড় হতে চায়, কিন্তু পরিস্থিতি তাদের স্বপ্নকে পদদলিত করে। এদের মধ্যে অনেকেই বর্ধিষ্ণু পরিবারের অন্তঃপুরে পর্দানসীনভাবে থাকতে অভ্যস্ত ছিলেন। অভাব কোনো নিয়ম মানে না, কাজেই অন্তঃপুর থেকে এই কুলবধুদেরকে একেবারে বাইরের জগতে টেনে বের করে আনে। এদের মধ্যে যারা খানিকটা শিক্ষিত ছিলেন, তারা শিক্ষকতা, অফিস দপ্তরে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, সেলস গার্ল ইত্যাদি কর্মে নিযুক্ত হন। কর্মপ্রপ্তির আশায় এই সময়ে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষিত হবার প্রবণতা দেখা যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল পরীক্ষাগুলিতে এর প্রভাব পড়ে। এই প্রসঙ্গে 1957 সালে অধ্যাপক অতীন্দ্রনাথ বোস এর উক্তিটি উল্লেখ্য, - "It is one of the signs of the times that womens education advanced at faster rate than men's". (75) কিন্তু শিক্ষিত হবার মতো সামর্থ্য সকলের ছিল না, কিন্তু আর্থিক উপার্জনের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ছিল। এই কারণে বহু নারী অন্যের বাড়িতে বাসন মাজা, অফিস পাড়ায় টিফিন ও তেলে ভাজার দোকান, সেলাই ও তাঁতের কাজ প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত হন। এমন কিছু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী সুযোগ পেয়ে সামান্য অর্থের বিনিময়ে নারীদের চালের চোরা কারবারের সাথে যুক্ত করেন। এই সময়ে অনেক মহিলা জঙ্গল, পোড়ো জমি প্রভৃতি স্থান থেকে কচুর ডাঁটা, মান কচু, শাক - পাতা তুলে এনে সেগুলি বাজারে বিক্রি করার জন্য চেষ্টা চালান। এতদিন সভ্য সমাজের মানুষের কাছে এগুলি বাজার থেকে কিনে খাওয়ার মতো সু- খাদ্য বলে

বিবেচিত ছিল না। এভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু নারীদের হাত ধরে খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন আসে। অভিনয় জগতে নারীর পদচারণা খুব একটা কাম্য ও অতিরিক্ত সম্মানজনক পেশা বলে মোটেও গণ্য হতো না। কিন্তু দেশভাগ অভিনয় জগতেও পরিবর্তন আনে। এই সময় বহু নারী আর্থিক প্রয়োজনে অভিনয়কে পেশা হিসেবে বেছে নেন। অভিনয় জগতে 'অভিনেত্রী ' পদটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। গ্রুপ থিয়েটারের সাথে যুক্ত দিপালী চক্রবর্তী, অভিনয় জগতে আসা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।(76) নারীদের মধ্যে বাইরের জগত সম্পর্কে সচেতনতা, শিক্ষিত হয়ে ওঠার যে প্রবণতা দেখা যায় তা নারী সমাজের জন্য সদর্থক বার্তা বহন করে আনে। আর এতে আগ্রহী পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে চলে আসতে বাধ্য হওয়া নারীরা। এই প্রসঙ্গে মনিকুন্তলা সেনের বক্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাঁর ভাষায়,- "পূর্ব বাংলায় থেকে গেলে হয়তো মেয়েদের এই পরিবর্তনটা আসতো না। দেশান্তরী নারী সময়ের দাবিকে সামনে রেখে দ্রুত বদল ঘটিয়েছে, পাশাপাশি বদলে দিয়েছে তার চারপাশের সমাজকে। জীবন সংগ্রামে উদ্বাস্তু মেয়েরা যেভাবে এগিয়ে এসেছিল, তাতে কেবল ওই ছিন্নমূল মানুষেরা পায়ের তলার মাটি খুঁজে পায়নি, সাধারণ ভাবে পশ্চিমবঙ্গের নারীমুক্তির পথ উন্মোচিত করেছিল।(77) ব্যক্তিগত পরিসর থেকে জনপরিসরে নারীদের আগমন পশ্চিমবঙ্গ বিভাজন - পরবর্তী সময়ের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যখন পরিস্থিতির প্রয়োজন হলো উদ্বাস্তু মেয়েরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাই তাদের লড়াই - সংগ্রাম চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। শিক্ষিত মহিলারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা এবং সরকারি ও আধা সরকারি অফিসে চাকরির সন্ধানে গিয়েছিলেন। যাদের শিক্ষা ছিল না, তারা হাল ছাড়েননি এবং আরও বেশি উদ্যমের সাথে লড়াই করেছিলেন। এদেশের স্থানীয় লোকেরা ভাবত যে, পূর্ব বঙ্গের মহিলাদের মুসলমানেরা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেছে। যেন মুসলমানরা তাদের সবাইকে ধর্ষণ করেছে। স্থানীয় লোকেরা উদ্বাস্তু মহিলাদের সাধারণ জলাশয়গুলি থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করতেও দিত না। ধীরে ধীরে উদ্বাস্তু মহিলারা অসহায়ত্বের অনুভূতি থেকে বেরিয়ে এসে বিজয়ীর মানসিকতায় উন্নীত হন। তারা বেশির ভাগই নিজেদের গৃহস্থালির কাজের প্রশিক্ষণকে বাণিজ্যিক কাজে লাগিয়েছিলেন। তারা আচার, পাঁপড়, বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য রান্নার সামগ্রী তৈরি করতেন। তাদের মধ্যে একটি অংশ কাগজের প্যাকেট এবং বেদি (একধরনের সিগারেট) বানানোর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কেউ কেউ ফেরিওয়ালা হিসেবে আরও কঠিন ও গতানুগতিকতার বাইরে কাজ বেছে

নিয়েছিলেন। কেউ কেউ পশ্চিমবঙ্গের জেল খানার মহিলা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডেন হয়েছিলেন। নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের উদ্বাস্তু মেয়েরা কলকাতার চলচ্চিত্রে, শিল্পে এবং বাণিজ্যিক প্রেক্ষাগৃহে অভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। প্রতিকূলতা ও অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে বহু সংগ্রামের পর তাদের মধ্যে কয়েকজন সফল নায়িকা হয়ে ওঠেন। উদ্বাস্তু ছিলেন এমন কয়েকজন বিখ্যাত বাঙালি নায়িকা হলেন সাবিত্রী ও মাধবী। দেশভাগের ফলে সৃষ্ট আলোড়ন বাস্তুচ্যুত নারীকে এমন এক পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছিল যেখানে তার মর্যাদা ও আত্মসম্মান গুরুতর বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। তৎকালীন বাংলা সাহিত্য, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র এবং নাটকে এর ব্যাপক প্রতিফলন ঘটেছে। এই প্রতিবন্ধকতা এতটাই তীব্র ছিল যে, - উদ্বাস্তু নারীদের আচরণ, মনোভাব এবং চিন্তাভাবনার ধরনে মৌলিক পরিবর্তন আনতে হয়েছিল। শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীলতার জন্য তাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা এই ক্ষেত্রে অন্যদের উৎসাহিত করেছিল। মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারগুলি অর্থনৈতিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও সাধারণত তাদের শিক্ষিত মেয়েদের চাকরি করতে দিতে অনিচ্ছুক ছিল। নবাগতদের দ্বারা মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের মানসিকতায় একটি গুরুতর আঘাত লাগে এবং পরিশেষে একটি সমগ্র বাঙালি জনগণের মানসিকতায় একটি বড় পরিবর্তন নিয়ে আসে। এর ফলস্বরূপ বাঙালি সমাজে একটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে(উদাহরণ স্বরূপ) কর্মজীবী নারী। পরিস্থিতির তাড়নায় উদ্বাস্তু নারীরা অন্যান্য অনেক মধ্যবিত্ত বাঙালি নারীরা জন্য জন্য বহু নতুন সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

উদ্বাস্তু নারীদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও সামাজিক বিপ্লব : - উদ্বাস্তু নারীদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের ফলে ঘরের বাইরে বেরিয়ে মজুরির নানা পেশায় তারা যোগদিল। ভেঙে গেল বাস্তব আর মানসিক অবরোধ। এই সীমানা অতিক্রমের সাথে সাথে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে তার ছাপ পড়ল। তৈরি হলো -

(i) মত প্রকাশের অধিকার

(ii) স্বাধীন ভাবে বেঁচে থাকার ভাবনা

(iii) প্রতিবাদ করার ভাষা পেল

(iv) সংসারের মূল চালিকা শক্তি হয়ে উঠলো।

সব উদ্বাস্তু মেয়েরা অফিসে কাজ পায়নি। কিন্তু নিজের বাঁচা আর পরিবারকে বাঁচানোর তাগিদে অগণিত কম বয়সের মেয়ে হাজির হয়েছে সমাজের কানাগলিতে। ঘরের বাইরে বেরিয়ে কাজে যোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রামে, ট্রেনে, বাসে ব্যাগ কাঁধে মেয়েদের ঘামে ভেজা চেহারাটা ক্রমশ ডালপালা ছড়িয়ে দিল কলকাতা শহরের বুকে। পুরুষদের সাথে গা ঘেঁষাঘেষি করে যাওয়া আসা, কাজের ক্ষেত্রে পাশাপাশি বসা, গল্প - গুজব এসব ঘটনা নারীকে নতুন জীবনের সন্ধান দেয়। ফলে পুরোনো মূল্যবোধ ও ধ্যান - ধারণা ভেঙে নতুন বোধের জন্ম হয়। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে তাকে ছুটতে হয়েছে, শিখতে হয়েছে, চামচ দিয়ে ভাত খেতে খেতে দ্রুত কুচি দিয়ে শাড়ি পড়ে নেবার কৌশল, রপ্ত করে নিয়েছে শাড়ি ব্লাউজের ম্যাচিং স্টাইল। আগের দিন বিকেলে বাজার হাট সেরে রাখা, সকালের রান্নার গোছগাছ করে রাখা, ঝটপট রান্না সেরে ছেলে মেয়েদের সামলানোর দায়িত্ব গ্রহণ করল নারী সমাজ।(78) কলকাতা শহরের পাশাপাশি গ্রাম - গঞ্জেও মেয়েদের কাজের ক্ষেত্র প্রসারিত হলো। শুধু পুরুষের রোজগারে সংসার চলছিল না, তাই নিজেদের উদ্যোগে কাজ খুঁজে নিল মেয়েরা। পরিবারের সদস্যরা ছড়িয়ে পড়ল নানা জায়গায়। যৌথ পরিবার ভেঙে টুকরো টুকরো হতে লাগলো। এই অবস্থায় যৌথ পরিবারের ঢিলেঢালা চলনের বদলে নারীরা সচেতন ও হিসেবী হয়ে ওঠে। গোটা একটি সংসারের সবটুকুই তার নিজের এই বোধ থেকেই সংসারের ব্যয় সংকোচন, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতে শুরু করে। এর ফলে আর্থিক উন্নয়ন ঘটে দ্রুত। স্বাধীনতা সময়কালে পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের পড়াশোনার বিশেষ চল ছিল না। মেয়েদের বয়স কুড়ি পার হওয়ার আগেই বিয়ে দেওয়া হতো। উদ্বাস্তুরা এদেশে আসার পর তাদের দেখাদেখি এখানকার মেয়েরাও লেখা পড়ায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। এর ফলে তাদের বিয়ের গড় বয়স বেড়ে যায়। রিফিউজিদের জন্য নতুন নতুন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এমনকি কলেজ স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। মেয়েদের স্কুল কলেজের সংখ্যাও দ্রুত বাড়তে থাকে। কলকাতার উপকণ্ঠে যে কলোনিগুলি গঠিত হয়েছিল তাদের জীবন সংগ্রামের পাশাপাশি একটা বিশেষ বিষয়ে ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়, তাহল শিক্ষার প্রতি অনুরাগ। মহিলাদের নামে বিদ্যালয় ও কলেজ তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন ক্যাম্প গুলিতে অবক্ষয়ের চিত্র ফুটে উঠেছে নানা সাহিত্যে। এই সময় নারীদের মধ্যেও সামাজিক অনুশাসন নেই, মূল্যবোধটুকুও হারিয়ে ফেলেছে। অনায়াসে যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত স্বামীকে ছেড়ে চলে যায়, বিবাহিত স্বামীর পরিবর্তে অন্য পুরুষের সাথে নতুন জীবন শুরু করে। কেউবা অবৈধ সন্তানকে পুঁজি করে ভিক্ষা ব্যবসা করে।(79) যুগ ও সমাজের দাবি মেনে মেয়েরা চলতি গদ্যে কথা

বলা অভ্যাস করে। কিন্তু বয়স্করা তাদের ভাষার আঞ্চলিকতা ত্যাগ করতে পারেন না। উদ্বাস্তুদের সামাজিক রীতিনীতিও পরিবর্তিত হয়। চাকরিরত মেয়েরা চাকরির প্রয়োজনে সংসারের অন্য সকলের আগেই খাবার খাওয়া অভ্যাস করে নেয়। পরিপাটি করে সেজেগুজে অফিসে বেরিয়ে যায়। সীমিত আয়ে সংসারকে পরিপাটি করে রাখতে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনগুলিতে নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা করে। আবার খরচ বাঁচাতে জামাকাপড় ধোপার বাড়িতে না দিয়ে বাড়িতেই কাচার ব্যবস্থা করে। বিভিন্ন উপন্যাসে শিক্ষার প্রতি উদ্বাস্তু নারীদের প্রবল আগ্রহ লক্ষিত হয়েছে। পরবর্তী কালে এই শিক্ষাই উদ্বাস্তু জীবনের ধারাকে বদলে দিয়েছে। কুন্তলা লাহিড়ী দত্ত তাঁর 'The Anglo Indians of Calcutta ' গ্রন্থে দেখিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তু পরিবারের মেয়েরা জীবিকা অর্জনের তাগিদে কর্ম জগতে প্রবেশ করেছিল।(80) মনিকুন্তলা সেন লিখেছেন পূর্ববঙ্গের এইসব মেয়েরা শিক্ষিকা, নার্স, কেরানী কোনো কাজ নেই? বরং পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের তুলনায় এরাই সম্ভবত রুজির ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই একটা ব্যাপারে একদিনের সর্বস্বহারা মেয়েরা পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের যে কি উপকার করেছে, তা হয়ত কেউই টের পায়নি। ঐ মেয়েদের নির্ভিক চলাফেরা এবং রুজির জন্য ঘা মেরে মেরে সমস্ত বন্ধ দুয়ারগুলি খুলে দেওয়া, সম্ভবত এদের প্রয়োজনের চাপ ও সংখ্যার চাপ ছাড়া সহজ হতো না।(81) বহির্জগতে নারীদের পদার্পণের ফল স্বরূপ নারী - পুরুষের বৈষম্যের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। নতুন শতাব্দী নারীদের জন্য নিয়ে আসে সমাজের রক্ষণশীলতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে ঘরের বাইরে মুক্ত হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেওয়ার সৌভাগ্য। সকলের কানে কানে শুনিয়ে যায়, - নারীরাও পারে পুরুষের সমকক্ষ এমনকি তার থেকে উচ্চ ক্ষমতায় আরোহণ করতে। এরই প্রস্তুতি স্বরূপ নতুন শতাব্দী আগমনের প্রাক মুহূর্ত থেকেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে মহাকাশ অভিযান সর্বত্র ধ্বনিত হতে শোনা যায় নারীদের জয়জয়কার। পূর্বের অধিকাংশ নারী ছিলেন সহধর্মিণীর মতো, কিন্তু যথাযথ অর্ধাঙ্গিনীর ভূমিকা পালন করতে পারতেন না। রক্ষণশীল সমাজ তাদেরকে সেই পথ থেকে কৌশলে সরিয়ে দিয়ে - সতী , লক্ষ্মীমন্ত স্ত্রী, সুমাতা প্রভৃতি গালভরা খেতাব এর মুকুট পরিয়ে ভুলিয়ে রাখতো। তবে বর্তমানে নারী কেবলমাত্র সহধর্মিণী ও অর্ধাঙ্গিনী নয়, তারা পুরুষদের যথাযথ সহযোদ্ধা। সামান্য কিছু রক্ষণশীল ব্যতিক্রমী পরিবার বাদ দিলে ঘরে ও বাইরে সর্বত্র নারীদের অবাধ বিচরণ। এই মুক্তির স্বাদ আমরা যারা একবিংশ শতাব্দীতে গ্রহণ করতে পারছি, তারা প্রত্যেকে কৃতজ্ঞ সেদিনের সেই সকল উদ্বাস্তু নারীদের প্রতি যারা সেদিন সমাজের

রক্ষণশীলতার ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে সাংসারিক প্রয়োজনে বাইরে উপার্জনের পথে পা বাড়িয়েছিলেন। তাদের পা সেদিন কন্টকবিদ্ধ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই পদযুগলের পবিত্র রক্তে তারা সেদিন যে নারী মুক্তির দেবীকে আহ্বান করে এনেছিলেন সেই আশীর্বাদের সুফল আমরা একবিংশ শতকের নারীরা ভোগ করছি। আজ যে নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে আমরা এত সচেতন তার সর্বাগ্র যোদ্ধা ছিলেন সেদিনের সেই তথাকথিত উচ্চশিক্ষার ডিগ্রীহীন, দরিদ্র, অত্যাচারিতা উদ্বাস্তু নারী, যারা নিজেদেরকে পুড়িয়ে আগামী প্রজন্মের জন্য বয়ে এনেছেন নারী মুক্তির বার্তা। পূর্ববঙ্গে ধনী - দরিদ্র নির্বিশেষে নারীর একটা নিজস্ব জগৎ ছিল। যে জগৎটা অনেকটা এইরকম, -

(i) সংসারের গণ্ডির মধ্যেই ছিল তার বিচরণ, বাইরের জগৎ ছিল একেবারেই অজানা।

(ii) বাইরের পুরুষ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন - যাপন।

(iii) রোজগারের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা ছিল নগণ্য।

(iv) বাইরে বেরিয়ে কাজে যাওয়া ছিল পারিবারিক সম্মানের অন্তরায়।

(v) পরিবারে নারীর মতামতের ভূমিকা ছিল না।

(vi) বর্ণগত ও অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ এমন পরিবারের মেয়েদেরই কেবলমাত্র শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

(vii) যৌথ পরিবারে মেয়েরা অভ্যস্ত ছিল।

কিন্তু দেশান্তর মেয়েলী জীবনকে বদলে দিয়েছে এক লহমায়। বোচকা বুচকি মাথায় করে লঞ্চ - স্টিমার, নৌকায় করে, পায়ে হেঁটে, ট্রেনে চড়ে আসতে আসতে নারীর সামনের পর্দা গেল সরে। স্টেশনে নির্বাসিত নারীর বদলে যেতে লাগলো পরিবারের গড়ন, সদর - অন্দরের ব্যবধান, ঘর - গেরস্থালির ধরন - ধারণ, কর্ম ক্ষেত্রের পরিবেশ, শহরের রাস্তা - ঘাটে অবাধ বিচরণ নারীকে এক নতুন জগতের সন্ধান দেয়। কলোনি রক্ষার সংগ্রামে, রাজনৈতিক প্রসঙ্গ নিয়ে পুরুষদের সাথে মেয়েরাও আলোচনায় যোগ দিতে শুরু করে। কাছাকাছি আসে দুই জগৎ। মেয়েরা রাস্তার কলে জল নিতে আসতে বাধ্য হয়, বাজারে যেতে হয়, উপার্জনে বেরোতে হয়, ফলে পুরুষের পৃথিবী আর মেয়েদের পৃথিবীর মধ্যে স্বাতন্ত্র বজায় রাখা সম্ভব হয় না। পুরুষের জগতের সান্নিধ্যে আসার ফলে নতুন বোধের সঙ্গে, ধারণার সঙ্গে নারীর পরিচয় ঘটে। এতদিনের আবছায়া জগৎ স্পষ্ট হতে লাগলো । ভেতরের - বাইরের ব্যবধান মুছে যাওয়া প্রসঙ্গে

গায়ত্রী চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন,- " The Private public devided break down " তাদের উপার্জিত অর্থ যখন থেকে সংসারের কাজে লাগলো তখন থেকেই সংসারে মেয়েদের কথা বলার জায়গা তৈরি হলো। কেমন যেন নারী - পুরুষের সম্পর্কের ধরন বদলে গেল। নারীর এই বদলের কতগুলি অভিমুখ রয়েছে,-

(i) মানব বিপর্যয়ের অভিঘাতে নারী নতুন মনোবল নিয়ে বেঁচে উঠেছে।

(ii) পুরুষের সাথে পা মিলিয়ে চলার সাহস ও ক্ষমতা অর্জন করেছে।

(iii) ঘরে বাইরে উভয় দিক সামলে নারীর নিজস্ব স্বত্বা তৈরি হয়েছে।

(iv) নারী কর্মব্যস্ত হয়ে উঠেছে

(v) পূর্ববঙ্গের যৌথ ও বৃহৎ পরিবারে অভ্যস্ত নারী ছোট পরিবারে আবদ্ধ হলো। নিত্য যাত্রীদের ভিড়ের চাপে অন্তঃসত্ত্বা মহিলার প্রসবের উদাহরণ আছে।(82) শিক্ষাকে হাতিয়ার করে বাঙালি উদ্বাস্তু নারী স্বয়ম্বরতার দিকে ক্রমশঃ পা বাড়াতে শুরু করেছিল। শিক্ষার সাথে সাথে ফেরী, হকারী, ওয়াডেন কিংবা সেলাই কলকে হাতিয়ার করে স্বনির্ভর হবার চেষ্টা করে, পরে তা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।(83) 1957 সালে অধ্যাপক অতীন্দ্র নাথ বোস দেখিয়েছেন,- শিক্ষার প্রতি বাঙালি মেয়েদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল পরীক্ষা গুলিতে। দেশভাগ নারীদের স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল করে তুলেছিল। কর্মক্ষেত্রে সম্মানজনক অবস্থান অর্জন করা স্বত্ত্বেও, বাস্তুচ্যুত কর্মজীবি নারীরা সমাজের কাছ থেকে নেতিবাচক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাদের পরিবারের কাছ থেকেও যথাযথ সম্মান পাননি। কারণ সমাজের সাধারণ ধারণা নারীদের ঘরের বাইরে অংশ গ্রহণকে সমর্থন করত না। এর ফলে অশরণার্থী নারীদের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তুচ্যুত নারীরা শিক্ষাগত ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনজীবনে আরও বেশি সম্পৃক্ত হয়েছিলেন।(84)

উপসংহার : - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাঙালি নারী জীবনের সবচেয়ে আলোড়িত ঘটনা অবশ্যই দেশবিভাগ এবং দেশান্তর। পশ্চিমবঙ্গে এসে এই শরণার্থীরা সামাজিক সংস্কারে বড় ধরনের পরিবর্তন আনেন। তাদের সম্পৃক্ততা এবং সাহসী আন্দোলন অন্যান্য বাঙালি নারীদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে প্রভাবিত করেছিল। এই বাস্তুচ্যুত নারীরা সেইসব বিদ্যমান বাঙালি নারীদের অনুসারী হয়ে ওঠেন। যারা মনোবল

হীনতার কারণে কিছু অর্জন করতে পারেননি। এতদিন পরিবারের যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুরুষের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। কিন্তু এই সময় থেকে ধীরে ধীরে উপার্জনকারী নারীর মতামতটিও পুরুষ সদস্যের মতামতের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সামাজিক - রাজনৈতিক দিক থেকে নারীদের মধ্যে সচেতনতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, গড়ে উঠতে থাকে একাধিক নারী সংঘ। এই নারী সংঘগুলি নারী - পুরুষ বৈষম্য জনিত অবিচার, পণ, মৃত্যু, ধর্ষণ, মদ্যপান জনিত গার্হস্থ্য হিংসা ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। এসবের ফলে সত্তরের দশক থেকে শুরু করে নব্বইয়ের দশক ধরে নারীর স্বার্থে স্থানীয় ও ব্যাপক মাত্রায় নানারূপ আন্দোলন সংঘটিত হতে থাকে।(85) কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীদেরকে প্রতিবাদী আন্দোলনে অংশ নিতে এবং নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই করতে দেখা গেছে। সমাজ কর্মীদের সহায়তায় এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন গুলির উদ্যোগে এই নারীরা সেইসব প্রতিকূল পরিস্থিতিতির বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি পেয়েছিলেন। বিশেষ করে যখন তাদের সন্তানদের প্রশ্ন আসত, তখন লড়াই করার জন্য তাদের ভেতরের শক্তি এক নতুন প্রেরণা পেত, এবং শেষ পর্যন্ত তারা সমস্ত বাধা অতিক্রম করে টিকে থাকতেন। তবে দেশভাগ তাদের যে মানসিক যন্ত্রণা দিয়েছিল তা আজও তাদের স্মৃতিতে বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্নের চেয়ে কম কিছু হয়ে নেই। তা স্বত্ত্বেও বলা যায়, এটি তাদের অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর হওয়ার এবং বাঙালি সমাজে 'শ্রমজীবী নারী ' (Working w) নামক একটি সম্পূর্ণ নতুন আত্মপরিচয় তৈরির ঐতিহাসিক সুযোগ করে দিয়েছিল। সুতরাং দেশভাগের ফলে সৃষ্ট অস্থিরতায় পূর্ব বঙ্গের হিন্দু উদ্বাস্তু নারীরা প্রচণ্ড দুর্ভোগের শিকার হলেও এখানেই গল্পের শেষ ছিল না। এই গল্পের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অংশটি ছিল এই যে, তারা অস্তিত্বের জন্য এমন এক অসাধারণ সংগ্রাম করেছিলেন যার কোনো তুলনা পশ্চিমবঙ্গের সমসাময়িক ইতিহাসে নেই। উদ্বাস্তু নারীদের ব্যক্তিগত পরিসর থেকে জন পরিসরে বেরিয়ে আসা সামগ্রিকভাবে বাঙালি নারীদের চিন্তা - ভাবনা ও মনোভাবের মধ্যে এক মৌলিক পরিবর্তন এনেছিল এবং তাদের আত্ম সচেতনতায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল।

তথ্যসূত্র : -

1, সিকদার, অশ্রুকুমার 2005, ' ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য ', দে'জ, প্রথম প্রকাশ কলকাতা, পৃ : 50

2, বাগচী, জে ও দাশগুপ্ত, এস, 2007, ' পূর্ব ভারতের লিঙ্গ ও বিভাজন : আঘাত ও বিজয় ',প্রথম খণ্ড, স্ত্রী, কলকাতা।

3, চ্যাটার্জি, 2021, আইবিডব্লিউবি, 1950, ফাইল নং 1838/48

4, সিনহা, ডি, সি ও দাশগুপ্ত, এ 2021, '1946 : দ্য ক্যালকাটা কিলিংস অ্যান্ড নোয়াখালী জেনো সাইড, একটি ঐতিহাসিক গবেষণা ', তুহিনা প্রকাশনী।

5, বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়, 1960, ' উদ্বাস্তু ', পৃঃ 156-157

6, মন্ডল, পলাশ, 2021, ' 'অধিকার অর্জনে উদ্বাস্তু বাঙালি নারীর প্রতিরোধ অন্দোলন : প্রেক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ ' (1947 - 1977) https://www.itihasadda.in/movement-of-bengali-ladies/

7, web,Rachel, 2007, Re(Creating) The Home : womens role in the development of refugee colonies in south Calcutta, Indian Journal of Gender studies (center for women development studies) VOL, 02, NO, 02, PP 195 - 210

8, কুন্ডু, ত্রিদিব সন্তপা, 2013, ' বার্ধক্যে বাস্তুচ্যুতি - বাংলার দেশভাগ জনিত দুর্ভোগের একটি দিক ', ইতিহাস অনুসন্ধান, খণ্ড, 19, পৃঃ 594

9, সেনগুপ্ত, নিলেন্দু, 2012, ' বিধানচন্দ্র ও সমকাল ', একুশ শতক, পৃঃ 125

10, Nandy, Ushasee, 2019, 'The refugee women in west bengal and its influence on b bengali culture', International Journal of Research in Engineering, Science and Management, VOL, 02, issue - 12 December, P - 581

11, Kudaisya, and Taj Young, ' The after of the Partition in South Asia ', Routledge Publication, Delhi, 2004, P - 22

12, দাশগুপ্ত, অভিজিৎ, 2018, বিস্থাপন ও নির্বাসন - ভারতে রাষ্ট্র উদ্বাস্তু সম্পর্কে কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, পৃঃ 19

13, নন্দী, ইউ, 2019, 'পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু নারী এবং বাংলা সংস্কৃতির ওপর এর প্রভাব ', ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ রিসার্চ ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, পূর্বে উল্লিখিত, VOL ,02, issues - 12, December, p - 581

14, যুগান্তর, 1950, (অমৃতবাজার পত্রিকা, 1950) কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের আর্কাইভ বিভাগ থেকে সংগৃহীত , 11 ই জুন।

15, অমৃতবাজার পত্রিকা, 1948, 8 ই অক্টোবর।

16, বসু, জয়ন্তী, 2013,(সম্পা) ' রিকনস্ট্রাক্টিং দ্য বেঙ্গল পার্টিশন ', সাম্য প্রকাশন, পৃঃ 101

17, মোঃ মান্নান, আব্দুল, খানম মেরী, সামসুন্নাহার, 2006, ' নারী ও রাজনীতি',অবসর প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, পৃঃ 120 -121

18, বাগচী, যশোধরা, 2012, ' নারী ও নারীর সমস্যা ', অনুষ্টুপ, মার্চ, কলকাতা, পৃঃ 105 - 107

19, দে, দেয়াল, 2017, 'উদ্বাস্তু নিপীড়ন কেন্দ্রে নারীর যৌনাঙ্গ : ভারত - পাক বিভাজন - 1947', গাঙচিল পত্রিকা - শরণার্থী সংখ্যা, গাঙচিল, কলকাতা, পৃঃ 44 - 45

20, সাক্সেনা, ভি. কে 1987,(সম্পাদক) 'দ্য পার্টিশন অফ বেঙ্গল ' কণিষ্ক পাবলিশিং হাউস, দিল্লী, পৃঃ 05

21,বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, 1994, 'দেশভাগ ও দেশ ত্যাগ ', কলকাতা, অনুষ্টুপ, পৃঃ 101

22, Choudhari, Basu, Anusua, Dey, Ishita, 2009, 'Citizens, Non Citizens and in the Camps lives', Mahanirban Calcutta Research group, P - 177

23, দত্ত, উত্তম, 2008, 'দেশবিভাগ : স্বপ্নপূরণ ও স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস ', সঞ্জয় সাহা (সম্পা), তিতির।

24, (i) আইবিডব্লিউবি, (গোয়েন্দা শাখা, পশ্চিমবঙ্গ) ফাইল সাতক্ষীরা, খুলনা, পূর্ব পাকিস্তান, 5 এপ্রিল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আর্কাইভ, ক্যালকাটা, ডব্লিউবিএসএ।

(ii) আইবিডব্লিউবি - 1950 (গোয়েন্দা শাখা, পশ্চিমবঙ্গ) ফাইল নং 1838/48, 18 জুন, আইবি বিভাগ, ডব্লিউএসএ (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আর্কাইভ)

25, দ্য অমৃতবাজার পত্রিকা, 1950, কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের আর্কাইভ বিভাগ থেকে সংগৃহীত।

26, দ্য আনন্দ বাজার পত্রিকা, 1950, কলকাতা, জাতীয় গ্রন্থাগারের আর্কাইভ বিভাগ থেকে সংগৃহীত, 6 অক্টোবর

27, ঘোষ, এস ও দত্ত, ডি, 2009,(গাঙ্গুলী - 2016) পি.এল ক্যাম্পের বিস্মৃত কণ্ঠস্বর।

28, চক্রবর্তী, সৌমেন, 2012 : ' বহুস্বরে উদ্বাস্তু সত্তায় বাঙালি ', মুক্তমন, পৃঃ 39

29, U Rao, Bhaskar, 1967, 'The story of Rehabilitation,' Government of India, P - 78, P.C Joshi Archive, New Delhi.

30, Displaced women and children from Pakistan, Construction and Function of the women Section, File no - 453/47, Public, Ministry of Home Affairs, Government of India. 1947, National Archive, New Delhi.

31, Sen, Uditi, 2018, Citizen refugee - Forging the Indian Nation after partition, Cambridge, University press, Newyork, P - 201 -204.

32, শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জলপাইগুড়ি এবং বর্তমানে ইউ.সি.আর.সি রাজ্য কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ।

33, সিং, তুষার, 1999, 'মারণ জয়ী সংগ্রামে বাস্তুহারা ' কলকাতা, দাশগুপ্ত, সংযুক্ত কেন্দ্রীয় শরণার্থী পরিষদ।

34, ওয়েবার, র্যাচেল, 2006, ' গৃহের পুনঃসৃষ্টি : দক্ষিণ কলকাতায় শরণার্থী কলোনির উন্নয়নে নারীর ভূমিকা '।

35, ভট্টাচার্য, দীপক এর সাক্ষাৎকার, 24 ফেব্রুয়ারী, 2021, প্রাক্তন কানুনগো অফিসার, (2011 - 2017) শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ।

36, দেবী, মানসীর সাক্ষাৎকার, 2021, 2 রা জানুয়ারি (মালদা বর্তমান ঠিকানা), পশ্চিমবঙ্গ।

37, সেন, মণিকুন্তলা, 2023, 'সেদিনের কথা ', নবপত্র, 2 য় প্রকাশ, কলকাতা, পৃঃ 184

38, দ্য সায়তাযুগ, 1950, বিশেষ শাখা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ক্রমিক নং 1937/51, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আর্কাইভ, (ডব্লিউবিএসএ কলকাতা) কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের আর্কাইভ বিভাগ থেকে সংগৃহীত, 28 ডিসেম্বর।

39, চ্যাটার্জী, 2021, পূর্বে উল্লিখিত।

40, চ্যাটার্জী, এস. এস, 2021, 'উদ্বাস্তু নারীদের দেশত্যাগ এবং তাদের প্রতিবাদ ' (1948 - 1958) এন. এস ও ইউ ওপেন জার্নাল 4(1)

41, বিশ্বাস, অধীর (সম্পাদিত) গাঙচিল পত্রিকা, শরণার্থী সূচনা সংখ্যা, জুলাই, 2017, কলকাতা, পৃঃ 75 - 77

42, রায়, সুমন, 2021, 'দেশবিভাগ ও নারী সমাজ: প্রসঙ্গ বাঙালি উদ্বাস্তু নারী ', ইতিহাস অনুসন্ধান, খণ্ড, 23, পৃঃ 767 -770

43, আনন্দ বাজার পত্রিকা, 1949, 27 শে এপ্রিল, পৃঃ 04

44, স্বাধীনতা, 1954, 11 ই জানুয়ারি, পৃঃ 05

45, স্বাধীনতা, 1954, 10 ই আগস্ট, পৃঃ 04

46, স্বাধীনতা, 1961, 5 ই ডিসেম্বর, পৃঃ 03

47, স্বাধীনতা, 24 শে ডিসেম্বর, 1961, পৃঃ 05

48, আনন্দ বাজার পত্রিকা, 24 শে ডিসেম্বর, 1957, পৃঃ 03

49, স্বাধীনতা, 1961, 20 শে ডিসেম্বর, পৃঃ 05

50, বিশ্বাস, মহীতোষ, 2012, ' পরতাল ', একবিংশ, কোলকাতা, পৃঃ 75

51, সেন, রমেশচন্দ্র, 1363 বঙ্গাব্দ, ' পূর্ব থেকে পশ্চিমে ', ভারতী, কোলকাতা, পৃঃ 111

52, ভাষা ও সংস্কৃতি (পত্রিকা), 2016, কোলকাতা, পৃঃ 370

53, স্বাধীনতা, 1955, 6 ই জুলাই, পৃঃ 03

54, আনন্দ বাজার পত্রিকা, 1957, 26 অক্টোবর, পৃঃ 03

55, বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়, 1970, পূর্বে উল্লিখিত

56, বাগচী, যশোধরা, 2014, 'পরিযায়ী নারী ও মানবাধিকার ', সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারী, পৃঃ 10

57, Mitra, Kasturi, 2012, 'Status of women migrants from Bangladesh to West Bengal and Orissa During 1971 - 2001', phd thesis, Department of Economic, Jadavpur University, Kolkata, P - 06

58, ইভান জেনকিন্স এর গোপনীয় কাগজপত্র, IOL/R13/1/176, তারিখ 4 এপ্রিল, 1947.

59, মেনন, রিতু ও কামনা ভাসিন, 2000, ' পুনরুদ্ধার, বিচ্ছেদ, প্রতিরোধ : ভারতীয় রাষ্ট্র এবং দেশভাগের সময় নারী অপহরণ ', পৃঃ 213

60, মেনন ও ভাসিন, 2000, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ 08

61, বসু, অপর্ণা, 1995, 'রেবেল উইথ এ কজ : মৃদুলা সারাভাই, একটি জীবনী ', নয়াদিল্লি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃঃ 179

62, মেনন ও ভাসিন, 2000, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ 22

63, মেনন, রিতু, 2008, (সম্পাদিত) 'নো উইমেন্স ল্যান্ড, কালি ফর উইমেন ', নিউ দিল্লী, পৃঃ 12 - 13

64, দ্য আনন্দ বাজার পত্রিকা, 1951, (গাঙ্গুলী) মহিলা সমিতির নতুন রূপ - নারীর কথা, 25 মে, 2016

65, বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়, 1970, পূর্বে উল্লিখিত, সাহিত্য সংসদ।

66, গাঙ্গুলী, এন, 2016, 'কলকাতায় উদ্বাস্তু মহিলা (1947 - 1958) জার্নাল অফ ইন্টারন্যাশনাল, ডিসপ্লেসমেন্ট 4(1) পৃঃ 12 - 17

গঙ্গোপাধ্যায়, বি, 2000, বাস্তুচ্যুতদের পুনঃএকত্রীকরণ ; গার্হস্থ্য বন্ধনের পুনর্গঠন : "উদয়ভিলার অভিজ্ঞতা বিষয়ক একটি প্রতিবেদন"।

67, বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ,2001, 'দেশভাগ, স্মৃতি আর সত্তা ', প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পৃঃ 90

68, ঘোষ, এস কে, 1981, নন্দী, ইউ, 2019, 'পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু নারী এবং বাংলা সংস্কৃতির উপর এর প্রভাব ', উইমেন ইন পুলিশিং কলকাতা : লাইট অ্যান্ড লাইফ পাবলিশার্স, পৃঃ 91

69, চক্রবর্তী, জি, 2005, নন্দী 2019, 'দেশ ভাগ থেকে বেরিয়ে আসা : বাংলার শরণার্থী নারী ', ব্লু জে বুকস, নয়াদিল্লি, পৃঃ 46

70, বৈদ্য, সমরেন্দ্র, 2010, 'পরবাস ', সকাল, প্রথম প্রকাশ কলকাতা, পৃঃ 68

71, সিকদার, অশ্রুকুমার, 2005, 'ভাঙ্গা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য ', দে'জ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পৃঃ 63 - 64

72, ঘোষ, গোপাল, আনন্দ, 2008, 'দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা ষাট : উদ্বাস্তু জীবন ও সাহিত্য ', তিতির, জুন, পৃঃ 13

73, সিকদার, অশ্রুকুমার, 2008 পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ 67 - 68

74, সেন, রুশতী, 2010, 'বাঙালি মেয়ের হাল বেহাল ', হর্ষ দত্ত ও স্বপন বসু (সম্পা), বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পৃঃ 203 - 204

75, সিকদার, অশ্রুকুমার, 2005, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ 11

76, বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়, চিত্রিতা, 2000, 'সময়ের উপকরণ : মেয়েদের স্মৃতিকথা ', পুস্তক বিপণি, পৃঃ 129

77, মুখোপাধ্যায়, অপূর্বকুমার, 2021, 'প্রসঙ্গ দেশভাগ ', বিতর্কিকা, পৃঃ 48 - 50

78, বন্দ্যোপাধ্যায়, জাগরী, 2008, 'মেয়েলী জীবন, ভাগাভাগির পরের যুগ ', সোমন্তী ঘোষ, (সম্পা), দেশভাগ, স্মৃতি আর স্তব্ধতা, গাঙচিল, প্রকাশ, কলকাতা, পৃঃ 116

79, মজুমদার, অমিয়ভূষণ, 1996, 'নির্বাস ', দে 'জ, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পৃঃ 74

80, Lahiri, Dutta, Kuntala, 1990, 'The Anglor Indians of Calcutta, the living City, VOL - 02, Minerva Associates.

81, সেন, মণিকুন্তলা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ 183 দাস, মিঠুন, 'দেশবিভাগ ও বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যা ', https://share.google/nbfESUFPPxchBrtTD.

82, চক্রবর্তী, প্রফুল্ল কুমার, 1997, 'প্রান্তিক মানব ', প্রতিক্ষণ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পৃঃ 19

83, রায়, রনজিৎ, 1977, 'ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গ ', শঙ্খ প্রকাশন, মার্চ, কলকাতা, পৃঃ 09

84, Educational Facilities for Displaced person, GOI, March, 1960, Ganguli ,2016

85, চন্দ্র, বিপণ, মুখার্জী, মৃদুলা, মুখার্জী, আদিত্য, 2023, লাহিড়ী, আশীষ, (অনু), ' স্বাধীনতার পরে 1947 - 2000', আনন্দ পাবলিশার্স, পৃঃ 541

সহায়ক গ্রন্থ : -

1, Ray, Bhadra, Kasturi, Status of women migrants book. https://share.google/wibrwnZngMkIViOoU.

2, Chakroborty, Gargee, 2025, 'Coming out of Partition : Refugee women of Bengal', https://share.google/vmnjwsonHDKIvLocu.

3, Chakroborty, poulami, 'The Refugee women, Partition of Bengal, Gender and the Political '.

4, দেবী, জ্যোতির্ময়ী, 1968, 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা ', বেঙ্গল পাবলিশার্স।

5, রায়,প্রফুল্ল, 1995/2003, 'কেয়াপাতার নৌকা ', করুণা প্রকাশনী।

6, রায়, সাবিত্রী,1952 'স্বরলিপি '

7, রায়, সুদীপ্তা, 'দেশভাগ ও বাঙালি নারীর জীবন '

8, Phd thesis (Bengali) - Ashis Kumar Hira, pdf - হীরা, কুমার, আশিস, 2016, 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন '(1947 - 1970)

9, Partition of Bengal : Impact on Displaced women and their Contribution to Refugee Movement in West Bengal – https://share.google/TsRIUeOHimNxCqhtH.

10, অধিকার অর্জনে উদ্বাস্তু বাঙালি নারীর প্রতিরোধ অন্দোলন : প্রেক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ (1947 - 1977) ইতিহাস আড্ডা, https://share.google/BnCMUZz65uUhhcFYi.

11, এ, জি, নুরানী, 2013, 'বাংলার দুঃখ ', তারিখবিহীন নথি, 05 মার্চ, http://www.frontlioconnet.com

12, আহমেদ,এস, 2004, 'বাংলাদেশ অতীত ও বর্তমান ', নয়াদিল্লি, এ পি এইচ পাবলিশিং, ইংরেজি।

13, চ্যাটার্জী, জয়া,2008, 'বেঙ্গল ডিভাইডেড : হিন্দু, কমিউনিজম অ্যান্ড পার্টিশন ', যুক্তরাজ্য : অ্যান্থেম প্রেস, ইংরেজি।

14, গুপ্ত, 2017, 'বাংলা চলচ্চিত্র : এক অন্যজাতি ' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : রাউটলেজ,

15, জে, দিদুর, 2007, 'বিভাজনের অস্বস্তি : সাহিত্য, লিঙ্গ, স্মৃতি ', নয়াদিল্লি, পিয়ারসন এডুকেশন ইন্ডিয়া, ইংরেজি।

16, জালাল, এ, 2013, 'দেশভাগের করুণা : ভারত পাকিস্তান বিভাজন জুড়ে মানটোর জীবন, সময় ও কথ ', নিউ জার্সি : প্রিন্সটন ইউনিভার্সি◌িটি প্রেস, ইংরেজি।

17, মেনন,আর এবং ভাসিন, কে, 1998/8, 'সীমান্ত ও সীমানা ', নয়াদিল্লি, রাটগার্স ইউনিভার্সিটি প্রেস, ইংরেজি।

18, রায়, সুদীপ্তা, 2026, 'দেশভাগ ও বাঙালি নারীর জীবন ', Partition and the life of Bengali refugee women, TRISANGAM INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL https://share.google/ADcx23Sbf9rrfrfiM.